বঙ্গ কমলবার্তা

ডিসেম্বর সংখ্যা। ২০২৩। মূল্য ২৫ টাকা

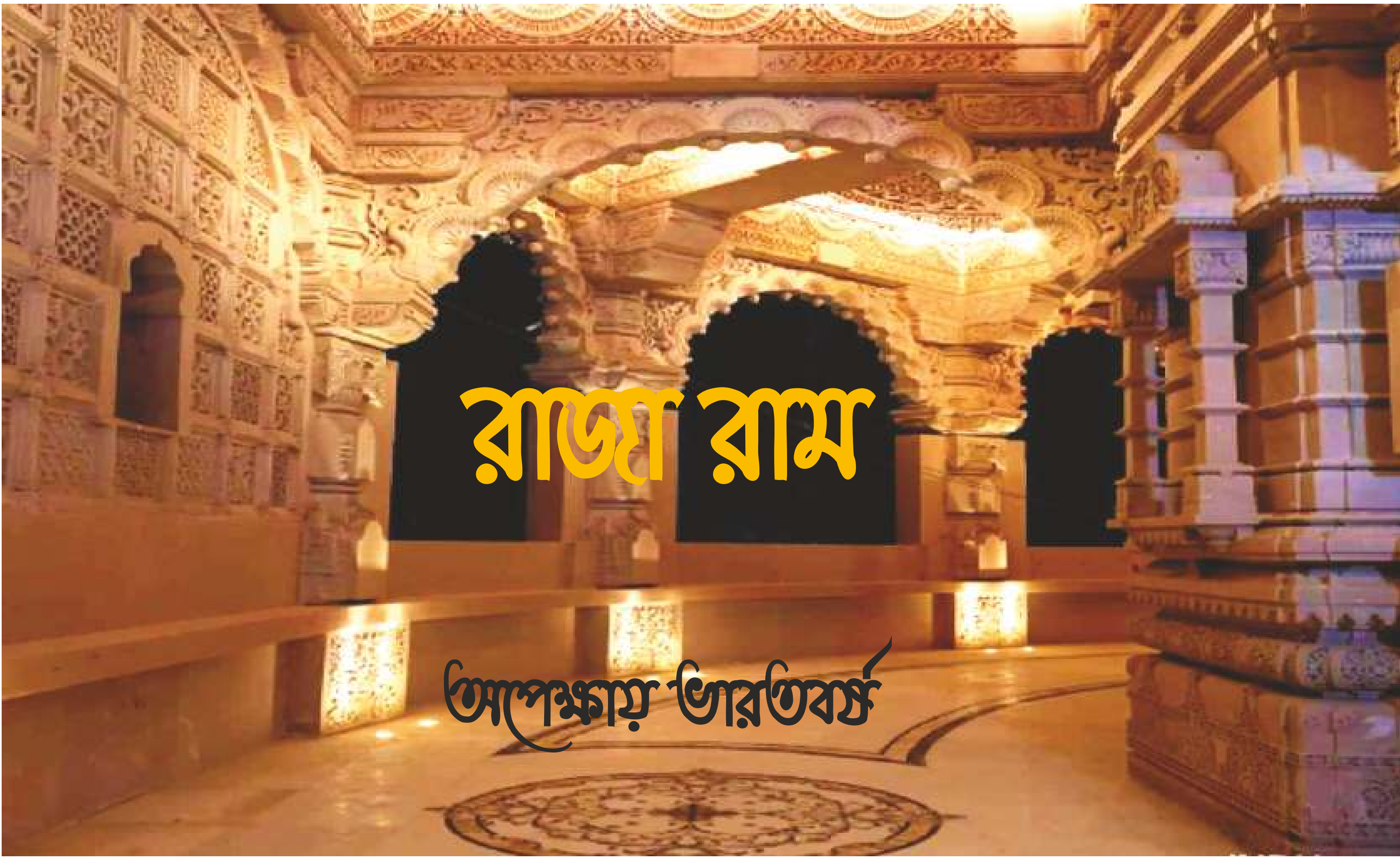

অযোধ্যায় নিজভূমে ঘরে ফিরছেন শ্রীরামচন্দ্র

অপ্রতিরোধ্য বিজেপি

বিকশিত ভারত মোদির গ্যারান্টি

সন্দেশখালির সন্দেশ

ডিএ চুরির সরকার

লাক্ষাদ্বীপ সফরে দ্বীপের মানুষজনের সঙ্গে উষ্ণ আলাপচারিতায় প্রধানমন্ত্রী।

অযোধ্যায় উষ্ণ অভ্যর্থনায় অভিভূত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

বঙ্গ কমলবার্তা

ডিসেম্বর সংখ্যা। ২০২৩

অযোধ্যায় ঘরে ফিরছেন শ্রীরামচন্দ্র ৪
শুভ্র চট্টোপাধ্যায়

ভারতীয় ও বাঙ্গালী সংস্কৃতিতে শ্রীরামচন্দ্র ৬
অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়

আজকের সন্দেশখালি আগামীর নোয়াখালি নয় তো? ৯
স্বাতী সেনাপতি

ডিএ চুরির সরকার আর নেই দরকার ১১
অভিরূপ ঘোষ

সচিত্র হীরক রানির কুকীর্তি (পর্ব-১) ১৪

ছবিতে খবর ১৬

তিন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, ভারতের রাজনীতিতে নতুন পথ নির্দেশিকা ২২
সৌভিক দত্ত

২৪-এর মহারণে অপ্রতিরোধ্য বিজেপি ২৫
ড. পঙ্কজ রায়

বিকশিত ভারত মোদির গ্যারান্টি ২৭
জয়ন্ত গুহ

দেশের 'বিশ্বকর্মা'-দের পাশে নরেন্দ্র মোদী ২৯
বিনয়ভূষণ দাশ

রাহুলের রাষ্ট্রবিরোধী চিন্তন ব্যাধি ৩১
পল্লব মন্ডল

ফেক নিউজ ৩৩

সম্পাদক: জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়
কার্যনির্বাহী সম্পাদক : অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়
সহযোগী সম্পাদক : জয়ন্ত গুহ
সম্পাদকমন্ডলী:
অভিরূপ ঘোষ, কৌশিক কর্মকার, উজ্জ্বল সান্যাল, অনিকেত মহাপাত্র
সার্কুলেশন: সঞ্জয় শর্মা

সম্পাদকীয়

"রাধার কী হইল অন্তরে ব্যথা।
বসিয়া বিরলে থাকিয়া একলে
না শুনে কাহারো কথা"।।

চণ্ডীদাসের পূর্বরাগ পর্যায়ের এই বিখ্যাত পদ কেন জানি কিছুদিন আগে বারবার মাথায় এসেছে যখন আমাদের রাজ্যের 'চৈতন্য অবতার', আমাদের রাজ্যের 'মাননীয়া', আমাদের রাজ্যের 'একমাত্র অনুপ্রেরণা' মানে আমাদের এগিয়ে বাংলার 'চৈতন্য দিদি' যখন মুখে কুলুপ এঁটেছিলেন সন্দেশখালিতে শাহজাহান কাণ্ডের পর। যদিও চুপ করে থাকা তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ। একাধারে চৈতন্যদেব, রামকৃষ্ণ, মা সারদামণির এই সাক্ষাৎ অবতার 'চৈতন্য দিদি'র চেতনা কম্পিউটারের মত হ্যাং করে যায় যখন সন্দেশখালিতে হিংস্র হায়নার মত শেখ শাহজাহানের লেলিয়ে দেওয়া অনুগামীরা মানে বহিরাগত রোহিঙ্গারা ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রাণে মেরে ফেলার চেষ্টা করে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের তদন্তকারী অফিসারদের। 'প্রাণে মেরে ফেলার চেষ্টা করে'-এটা শুধু আমরা বলছিনা, বলেছে একাধিক সর্বভারতীয় চ্যানেলও। কুখ্যাত গুন্ডা, ৩ বিজেপি কর্মী খুনের অভিযোগে অভিযুক্ত, ভেড়ি মাফিয়া, সন্দেশখালির ডন এবং এলাকায় তৃণমূলের সর্বেসর্বা এই শাহজাহানরাই তৃণমূলের বঙ্গ বিভূষণ। এরা যেদিন থাকবে না সেদিন 'চৈতন্য দিদি'র অর্থের যোগাড় এবং ক্ষমতার উৎস কিছুই থাকবে না। 'ব্রাত্য' হয়ে যাবেন 'চৈতন্য দিদি'। সেদিন বাচাল 'জেলখাটা ঘোষদের' মুখে-পাত্র ধরার জন্য কেউ থাকবে না, হাফপ্যান্ট পরে গাড়ি ধোয়াতে হবে। অপেক্ষা শুধু সময়ের। বারবেলায় সিপিএমের একদা ত্রাস মজিদ মাষ্টার বা লক্ষন শেঠও ইঁদুর হয়ে যায়। নেংটি ইঁদুর। বাংলার উন্নয়ন নয়, দিনের পর দিন 'চৈতন্য দিদি' নিরলস সাধনায় এই শেখ শাহজাহানদের তৈরি করেছেন বাংলাকে লুঠে খাওয়ার জন্য। গরীব মানুষের রেশন চুরির জন্য। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে অবাধ পাচার এবং চোরাপথে বাংলাদেশের রোহিঙ্গাদের অনুপ্রবেশের জন্য। সময় আসছে যখন জনতার আদালতে প্রশ্ন উঠবে, কাদের প্রশ্রয়ে বাংলা জুড়ে তৈরি হয়েছিল শেখ শাহজাহানদের মৌরসিপাট্টা ? প্রশ্ন উঠবেই, কেন 'সেকুলার চৈতন্য দিদি'র সঙ্গে প্রকাশ্য সভায় বারবার দেখা গিয়েছিল মৌলানা বরকতি বা ইদ্রিশ আলিকে? ২০১১ সালে কুখ্যাত ইসলামি সন্ত্রাসবাদী ওসামা বিন লাদেনের মৃত্যুর পর কলকাতায় টিপু সুলতান মসজিদের ইমাম মৌলানা বরকতি, লাদেনের সম্মানে বিশেষ প্রার্থনার আয়োজন করেছিল যা দেশের মধ্যে নজিরবিহীন ঘটনা। আর ইদ্রিশ আলি? তসলিমা নাসরিনের বিরুদ্ধে দাঙ্গায় অভিযুক্ত ইদ্রিশ পরবর্তীকালে রাজ্যের 'মাননীয়া'-র কাছের মানুষ! সন্দেশখালির ঘটনা বাংলায় বসবাসকারী প্রতিটি বাঙালীর জন্য বিশেষ সন্দেশ বা বার্তা যার সলতে পাকানো শুরু হয়েছিল বাম আমলে - তসলিমা নাসরিনকে কেন্দ্র করে পার্ক সার্কাসের দাঙ্গায়। শ্রীরামচন্দ্র ও তাঁর জন্মভূমি নিয়ে দেশজুড়ে কতশত আপত্তি-বিরোধিতা ঝেড়ে ফেলে সবার চৈতন্য ফিরে এল। রাম লালার প্রাণপ্রতিষ্ঠা হতে চলেছে আগামী ২২ জানুয়ারি। চৈতন্য ফিরেছে কাশ্মীরেও। সেখানে কেউ আর ইসলামি জঙ্গি-মাফিয়াদের পাত্তা দেয়না। আর সেখানে এক নগন্য 'চৈতন্য দিদি' যাকে বাংলার বাইরে কেউ দুআনা দিয়েও পাত্তা দেয়না, তিনি বাংলায় তাঁর সরকার বাঁচাতে শাহজাহানদের মত সমাজবিরোধীদের আড়াল করছেন প্রতিদিন! এমন চৈতন্য যেন বাংলার কোন 'ঘরের মেয়ে'-র না হয়।

জয় হিন্দ। জয় শ্রী রামচন্দ্রের জয়।

অযোধ্যায় ঘরে ফিরছেন শ্রীরামচন্দ্র
অপেক্ষায় গোটা ভারতবর্ষ

শুভ্র চট্টোপাধ্যায়

রঘুপতি রাঘব রাজারাম, পতিতা পাবন সীতারাম অযোধ্যায় আসছেন। নিজভূমে অযোধ্যায় অবশেষে ফিরে আসছেন মর্যাদা পুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্র। আসমুদ্র-হিমাচল ভারতবর্ষ তাঁর অপেক্ষায়। দীর্ঘ প্রায় ৫০০ বছরের লড়াই, প্রতীক্ষা শেষে তিনি ফিরে আসছেন তাঁর জন্মভূমিতে। এক্ষুনি যারা যেতে পারছেন না অযোধ্যায় তাঁদের নিশ্চয়ই জানতে ইচ্ছা করছে কেমন আছে অযোধ্যা, কি হচ্ছে অযোধ্যায়? শুনুন সরাসরি রাম জন্মভূমি থেকে আমাদের প্রতিনিধি শুভ্র চট্টোপাধ্যায়ের রিপোর্টিং।

রামলালার মূর্তিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হবে ২২ জানুয়ারি। তবে ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে অযোধ্যায় পা রাখতেই মনে হল উৎসব যেন শুরু হয়ে গিয়েছে। পুণ্যভূমির সর্বত্র শুধু ভগবান শ্রীরামচন্দ্র। দোকানে, বাড়ির দেওয়ালে, এমনকি বাড়ির দরজাতেও। বুঝতে অসুবিধা হল না, গোটা অয়োধ্যা এখন রামচন্দ্রময়। জলে, স্থলে, আকাশে, বাতাসে কান পাতলে শোনা যাচ্ছে একটাই ধ্বনি, 'জয় শ্রীরাম'। আগের অযোধ্যার সঙ্গে ফারাকও বিস্তর। ২২ জানুয়ারির সেই শুভ মুহূর্তটা যত এগিয়ে আসছে, কর্মব্যস্ততা ততই বাড়ছে। কারণ প্রশাসনও জানে, ক'টা দিন পরই গোটা বিশ্ব হয়ে উঠবে অযোধ্যামুখী। তাঁদের আকৃষ্ট করতে প্রশাসনের চেষ্টার খামতি নেই। রাম মন্দির থেকে সরযূ নদী পর্যন্ত রাস্তার নাম রামপথ। আগে সংকীর্ণ রাস্তা থাকলেও বর্তমানে তা বেশ চওড়া করেছে যোগী আদিত্যনাথ সরকার। রামপথের পাশেই নজরে পড়ল বিরাট পার্ক। শিশুদের খেলাধূলা ও বড়দের শরীরচর্চার জন্য নির্মিত ওই পার্কের গেট থেকে দেওয়াল, ভিতরে বসার জায়গাতেও রয়েছে সনাতন সংস্কৃতির ছোঁয়া। পার্কের কেন্দ্রস্থলে রয়েছে মন্দিরের মতো একটি নির্মাণ। সেখানেই বসানো হয়েছে ধ্যানরত এক মুনির মূর্তি। পার্কের পিছনেই ছিল আমাদের হোটেল 'প্রেমসি গেস্ট হাউস'। আমাদের থাকার ব্যবস্থা ছিল গেস্ট হাউসের দ্বিতীয় তলে। রাম মন্দির থেকে দূরত্ব ১ কিমির মধ্যেই। হোটেল মালিক ধর্মেন্দ্র মিশ্র। পেশায় দিল্লিতে ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন বলে জানা গেল। ৩৬ বছর বয়সী ধর্মেন্দ্র মিশ্র জানালেন, অযোধ্যায় ভিড় আগের থেকে অনেক বেড়েছে। রাম ভক্তদের পা পড়ছে তাঁর হোটেলেও।

রামের ঘরে ফেরা

অনেকের সঙ্গে কথা বলেই বোঝা গেল, তাঁদের কাউন্ট ডাউন শুরু হয়ে গিয়েছে। রাস্তাঘাট থেকে পুরাতন বাড়ি, সব জায়গায় চলছে সংস্কার। আমার মতো অযোধ্যায় পা রেখে যে কারও মনে হতেই পারে, হিন্দু সংস্কৃতির ভরকেন্দ্র হয়ে উঠেছে অযোধ্যা। বাড়ির দেওয়াল থেকে পার্ক, সর্বত্রই ছাপ সনাতন সংস্কৃতির। দোকানের দরজাতেও লেখা 'জয় শ্রীরাম'। দেদার বিক্রি হচ্ছে রামচন্দ্র-হনুমানের ছবি আঁকা গৈরিক পতাকা। এ যেন সত্যিই রামের ঘরে ফেরা।

ভগবান রাম যেন সবার

এখানকার মানুষ একটা বিষয় নিয়ে বেজায় খুশি। তা হল, এ শুধু রামের ঘরে ফেরাই নয়, অযোধ্যার অর্থনীতিরও আমূল পরিবর্তন আসছে। রামসীতা-হনুমানের মূর্তি তৈরি করেন জনৈক সন্তোষ শর্মা। তাঁর চোখেমুখে যেন খুশি ঝরে পড়ছে। তাই প্রতিবেদককে অকপটেই বলে দিলেন, "আগের থেকে বিক্রি বহুগুণ বেড়ে গিয়েছে।" রামনগরীতে ঢোকার মুখে দিব্য কুণ্ড জলাশয় বাঁধানোর কাজ চলছে। দেখলাম, সেটাও প্রায় শেষের দিকে। শ্রমিকরা বললেন, "গত ১ বছর ধরেই চলছে কাজ। আর কয়েক দিনেই সম্পূর্ণ হয়ে যাবে।" প্রশাসনও নিরাপত্তার নিরিখে এক ইঞ্চি জমি ছাড়তে নারাজ। তাই পথের মোড়ে মোড়ে চোখে পড়ল পুলিশি ব্যারিকেড। বুঝলাম, নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হচ্ছে রামনগরী। অযোধ্যার অলি-গলি-তস্য গলি চষে দেখলাম, কমবেশি সব বাড়ির ছাদেই উড়ছে শ্রীরামের ছবি বসানো পতাকা। কোনও ধনী-দরিদ্র ভাগ নেই। ভগবান রাম যেন সবার হয়ে উঠেছেন।

ফিরে পেয়েছে পুরনো মর্যাদা

২০০৭ সালে সুপ্রিম কোর্টে এফিডেফিট দাখিল করে তৎকালীন কংগ্রেস সরকার জানিয়েছিল, রামের অস্তিত্ব নেই। কিন্তু অযোধ্যার রাস্তাঘাট, পার্ক, জলাশয়, দোকান, বাড়ির ছাদ সবেতেই দেখা যাচ্ছে রামচন্দ্রকে। সন্ধ্যায় পুণ্যতোয়া সরযূ নদীর ধারে ভক্ত সমাগমই বলে দিচ্ছে আধ্যাত্মিক

রাতের আলোয় মায়াবী রাম মন্দির।

রাম মন্দির চত্বরে কুবের দুর্গে জটায়ু মূর্তি।

ভূমির মাহাত্ম্য। জানা গেল, এখানে রোজই চলে সরযূ আরতি। চলতি বছরের দীপাবলি থেকে শুরু হয়েছে অযোধ্যায় লেজার শো। গোটা রামায়ণকে লাইট শো-এর মাধ্যমে প্রতিদিন সরযূ আরতির পরে দেখানো হয়। অযোধ্যা কি বদলে গিয়েছে? প্রতিবেদকের এমন প্রশ্ন শুনে সরযূ-আরতি সমিতির সভাপতি মহারাজ শশীকান্ত দাস বললেন, ''আগে তো কেউই অযোধ্যা আসতেন না। দেশ থেকে পর্যটকদের ভিড় সেভাবে দেখাও যেত না। কারণ সবাই ভীত ছিলেন কখন ঝামেলা শুরু হয়ে যাবে! তখন অযোধ্যার প্রতি সবাই ছিলেন একেবারেই উদাস। কিন্তু এখন সময় বদলেছে। মন্দির নির্মাণ হচ্ছে, যার অবদান, কৃতিত্ব অবশ্যই নরেন্দ্র মোদির। বদলেছে অযোধ্যা। পাঁচশো বছর পরে নগরী ফিরে পেয়েছে পুরনো মর্যাদা।"

অযোধ্যা ধামে নবনির্মিত মহর্ষি বাল্মীকি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর জুড়ে রাম লালা।

আত্মনির্ভর রামমন্দির

মন্দির চত্বরেই থাকবে পাওয়ার স্টেশন। যেখান থেকে বিদ্যুৎ বন্টন করা হবে মন্দিরের বিভিন্ন বিভাগে। আবার জল সরবরাহের জন্য তৈরি হচ্ছে মন্দিরের নিজস্ব ওয়াটার প্ল্যান্টও। রামমন্দিরের ঠিক পিছনে থাকবে দিব্যাঙ্গদের জন্য লিফটও। রামমন্দির ট্রাস্টের মতে, "লাখ লাখ দর্শনার্থী আসবেন মন্দির দর্শনে। তাঁরা পরিক্রমা করবেন মন্দির। তাই তাঁদের জন্য সমস্ত রকমের পরিষেবার ব্যবস্থা করা হবে।" মন্দির চত্বরেই মিলবে চিকিৎসা ব্যবস্থাও। গড়ে উঠছে স্বাস্থ্য কেন্দ্র। আবার ভক্তরা যাতে বিশ্রাম নিতে পারেন সেজন্য তৈরি হচ্ছে বিশ্রামাগারও। জানা গিয়েছে রেলের মতোই হবে এই বিশ্রামাগার। যেখানে ভক্তরা নিজেদের মোবাইল, জুতো, ব্যাগ ইত্যাদি সামগ্রী রাখতে পারবেন। এরজন্য আলাদা কোনও চার্জও দিতে হবে না।

বশিষ্ট থেকে অহল্যা, বিশ্বামিত্র থেকে নিষাদ রাজের মন্দির

রামজন্মভূমি প্রাঙ্গণে মন্দির তৈরি হবে আরও বেশ কতগুলি। ভগবান রামচন্দ্রের জীবনে বিশেষ অবদান রয়েছে যাঁদের তাঁদেরও মন্দির তৈরি হবে। বাল্মিকী, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, অগস্ত্য, মাতা শবরী, নিষাদরাজ গোহু, অহল্যা এই সাত মন্দির থাকবে রামন্দিরের প্রাঙ্গণে। অর্থাৎ ভক্তরা মন্দির চত্বরে এলেই আরেকবার রামায়ণ মহাকাব্যকেই চাক্ষুষ করতে পারবেন। রামের জীবনে অবদান ছিল জটায়ুরও। তাঁর মূর্তি ইতিমধ্যে কুবের টিলাতে স্থাপন করা হয়েছে। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতীয় রীতির মেলবন্ধনে তৈরি হচ্ছে মন্দির। প্রসঙ্গত, দক্ষিণ ভারতীয় মন্দির রীতি 'গোপুরম' নামে পরিচিত এবং উত্তর ভারতীয় মন্দির রীতিকে নাগারা বলে। এই দুই রীতির ছোঁয়া দেখা যাবে রাম মন্দিরে। অন্যদিকে ভগবান শঙ্করাচার্যের ভাবনা অনুযায়ী 'পঞ্চায়তন' ধারণার ছোঁয়াও দেখা যাবে মন্দির চত্বরে। 'পঞ্চায়তন' হল পাঁচ দেবদেবীর মন্দির। সূর্য, শঙ্কর, ভগবতী, গণপতি এবং বিষ্ণু। মূল রাম মন্দিরের চার দিকে এই মন্দিরগুলি থাকবে। ভগবান রামকেই বিষ্ণুর অবতার মানা হয় তাই আলাদাভাবে কোনও বিষ্ণু মন্দির থাকছে না।

৭০ একর জায়গার মধ্যে ২০ একরে তৈরি হচ্ছে রাম মন্দির

সর্বভারতীয় সাংবাদিক বৈঠকে ট্রাস্টের সাধারণ সম্পাদক চম্পত রাই জানিয়েছেন, সুপ্রিম কোর্টের রায়ে ৭০ একর জমি পেয়েছি আমরা। কিন্তু এর মধ্যে ২০ একর জায়গা জুড়ে অবস্থান করবে মন্দির প্রাঙ্গণ। বাকি জায়গায় ১০০-এরও বেশি বৃক্ষরোপণ করা হবে বলে জানিয়েছে তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্ট। এদিন চম্পত রাই আরও বলেন, ''৭০ একর জায়গার একেবারে উত্তর দিকেই তৈরি হচ্ছে রাম মন্দির। সমগ্র ভূমির যে প্লট নিয়ে বিবাদ এবং বিতর্ক ছিল সেই স্থানেই তৈরি হচ্ছে মন্দির।"

অযোধ্যা শহরের অলিগলিতে শ্রীরামচন্দ্র।

ভারতীয় ও বাঙ্গালী সংস্কৃতিতে শ্রীরামচন্দ্র

অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতীয় মার্কসবাদী এবং স্তালিনপন্থী অতি-বামপন্থীরা প্রায় কুসংস্কারের মতই দাঁতে দাঁত চেপে বিশ্বাস করে, "শ্রীরামচন্দ্রের কোন অস্তিত্ব কখনও ছিলনা এবং ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে রামচন্দ্রের কোনও সম্পর্ক নেই"। অথচ কি আশ্চর্য, বামপন্থীদের 'বিপ্লবের পুণ্যভূমি' সোভিয়েত রাশিয়ায়, ১৯৪৮ সালে হিন্দু মহাকাব্য রামায়ণ রাশিয়ান ভাষায় অনুবাদ হয়। এখনও পর্যন্ত রাশিয়ায় ছোটদের রামায়ণ এবং ভারতবর্ষকে গভীরভাবে বুঝতে গেলে রামায়ণ নিয়ে সিরিয়াস বই ও থিয়েটার খুব জনপ্রিয়। আর বাংলায় ? রামচন্দ্র আছেন প্রতিটি বাঙ্গালী, এমনকি সাবঅল্টার্ন বাঙ্গালীরও রক্তে-রন্ধ্রে। কি করে ভুলি বলুন তো, অদ্ভুত সেই ছড়া - "ভূত আমার পুত, পেত্নী আমার ঝি/ রাম লক্ষ্মণ বুকে আছে, ভয়টা আমার কি?" একি শুধুই ছড়া? নাকি বাংলায় যুগ যুগ ধরে বংশ পরম্পরায় প্রবাহিত রামমন্ত্রের এক কাব্যিক উচ্চারণ!

ভারতীয় সংস্কৃতিতে শ্রীরামচন্দ্র একজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। বিভিন্ন হিন্দু পুরাণ অনুসারে বিষ্ণুর দশাবতারের অন্যতম হলেন অযোধ্যার রাজা দশরথের পুত্র রাম। ফলে রামচন্দ্র অন্যতম হিন্দু দেবতাও বটে। ভারতীয় ঐতিহ্যে মানুষের দেবত্বে উত্তীর্ণ হওয়া এবং দেবতার মনুষ্যরূপ ধারণ একটি সাধারণ ঘটনা। ভারতের দুই শ্রেষ্ঠ মহাকাব্যের অন্যতম রামায়ণের কেন্দ্রীয় চরিত্র এই রামচন্দ্র। যে রামায়ণের ওপর নির্ভর করে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে ও বিভিন্ন ভাষায় যুগে যুগে রচিত হয়েছে অসংখ্য কাব্য, নাটকসহ অগুন্তি সাহিত্য। ভারতীয় সংস্কৃতির বিস্তার যেখানেই ঘটেছে সেখানেই শ্রীরামও পৌঁছে গেছেন। তাই সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব ও দক্ষিণ এশিয়াতেই রামচন্দ্রের প্রভাব দেখা যায়।

ভারতীয় জনজীবনে রামচন্দ্র ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায়, "বাল্মীকির রামচরিত কথাকে কেবলমাত্র কবির কাব্য বলিয়া দেখিবেন না, তাহাকে ভারতবর্ষের রামায়ণ বলিয়া জানিবেন··· ইহার সরল অনুষ্টুপ ছন্দে ভারতবর্ষের সহস্র বছরের হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত হইয়া আসিতেছে।" ভারতবর্ষের সবথেকে বড় উৎসব 'দীপাবলী'- যা রামচন্দ্রের লঙ্কা থেকে অযোধ্যায় ফেরা উপলক্ষ্যে পালিত হয়। 'দশেরা' ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে অন্যতম বড় উৎসব - যা কিনা রামচন্দ্রের লঙ্কাধিপতি রাবণকে পরাজিত করা উপলক্ষ্যে উদযাপিত হয়। অর্থাৎ শ্রীলঙ্কা থেকে অযোধ্যায় পৌঁছতে শ্রীরামচন্দ্রের সময় লেগেছিল ২১ দিন। মজার কথা হল যে, আধুনিক প্রযুক্তিও বলছে শ্রীলঙ্কা থেকে পায়ে হেঁটে অযোধ্যা পৌঁছতে কোন মানুষের প্রায় ২১ দিন লাগতে পারে। উত্তর ভারতের বহু মানুষ পরস্পরকে সম্বোধন করেন "রাম রাম" বলে। মৃত্যুর পর শোনা যায়- "রাম নাম সত্য হ্যায়।" এইভাবে প্রত্যেক ভারতীয়-র জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত রয়েছেন রামচন্দ্র। ভারতীয় সংস্কৃতিতে আদর্শ প্রজানুরঞ্জক, প্রজা কল্যাণকারী রাজ্য - যে রাজ্যে সাধারণ মানুষ সুখে শান্তিতে বসবাস করতে পারে তাকে 'রামরাজ্য' বলা হয়ে থাকে। এই 'রামরাজ্য' স্থাপনের কথা গান্ধীজীও বলতেন। অনেকের মতে, গান্ধীজী মৃত্যুর আগের শেষ কথাও ছিল - "হে রাম।"

এবার আসা যাক আমাদের বঙ্গভূমির দিকে। বাঙ্গালীর সবথেকে বড় উৎসব

অযোধ্যা ধামে ভাইদের সঙ্গে প্রভু শ্রীরামচন্দ্র।

শারদীয়া দুর্গা পূজা। আমরা সকলেই জানি শরৎকালে মায়ের অকাল বোধন প্রথম করেছিলেন রামচন্দ্র - তার আগে মূলত পূজা হত বসন্ত কালে। এই অনুযায়ীই আজও বাঙ্গালী শরৎকালে মাতৃ আরাধনা করে চলেছে। বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে বাচ্চাদের আজও শেখান হয় ভূতের ভয় পেলে বলতে - "ভূত আমার পুত, পেত্নী আমার ঝি/ রাম লক্ষ্মণ বুকে আছে, ভয়টা আমার কি?" হাওড়ার রামরাজাতলা, হুগলীর শ্রীরামপুরসহ গোটা বাংলা জুড়ে অসংখ্য স্থাননামের সঙ্গে (মূলত রামনগর, রামপুর ইত্যাদি) রামের সম্পর্ক রয়েছে। এবার আমরা যদি বঙ্গের প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইতিহাসের দিকে নজর দি তাহলে সেখানেও রামের প্রবল উপস্থিতি লক্ষ্য করব। বাংলায় রচিত সংস্কৃত সাহিত্যগুলির মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ হল সন্ধ্যাকর নন্দীর লেখা 'রামচরিত'। পাল বংশীয় রাজা রাম পালের সভাকবি ছিলেন সন্ধ্যাকর নন্দী। এই 'রামচরিত' কাব্য হল একটি দ্ব্যর্থবোধক কাব্য- অর্থাৎ এখানে একই সঙ্গে তিনি রামচন্দ্রের কৃতিত্ব বর্ণনার আড়ালে পাল বংশীয় নৃপতি রাম পালের নানা কীর্তি-কাহিনির বর্ণনা করেছেন। মধ্যযুগে বাংলায় কৃত্তিবাস ওঝা 'শ্রীরাম পাঁচালি' রচনা করেন - এই কৃত্তিবাসী রামায়ণ আজও বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে পঠিত হয়। ৫১টি শক্তিপীঠের অন্যতম হল - বীরভূমের লাভপুরের ফুল্লরা দেবীর মন্দির। সতীর অধর (নীচের ঠোঁট) এখানে পড়েছিল। বিশ্বাস যে, মন্দিরের পাশের বড় পুষ্করিণী থেকেই হনুমান রামচন্দ্রের জন্য ১০৮টি নীল পদ্ম সংগ্রহ করেন- যা দেবী দুর্গার পূজার জন্য তাঁর প্রয়োজন ছিল। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পরিবারের উপাস্য দেবতা ছিলেন শ্রীরাম। তাই ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়ের তিন পুত্রের নামই শুরু হয় রাম দিয়ে - রামকুমার, রামেশ্বর এবং রামকৃষ্ণ। রাণী রাসমণি দেবীর পরিবারের কুলদেবতাও ছিলেন রঘুবীর - যা আদতে রঘু বংশীয় বীর রামচন্দ্রকেই বোঝাচ্ছে। সুকুমার সেন দেখাচ্ছেন যে, বিষ্ণু মন্ত্রে দীক্ষা নেওয়ার আগে বাংলার মানুষ রাম মন্ত্রে দীক্ষা নিত। কাজী নজরুল ইসলামের গান আছে রামচন্দ্রকে নিয়ে - "রসঘন রাম। নব দূর্বাদল শ্যাম।" বিশিষ্ট ক্ষেত্র সমীক্ষক ও লোকসংস্কৃতিবিদ ডঃ স্বপন কুমার ঠাকুর তাঁর বিভিন্ন লেখায় বঙ্গীয় সংস্কৃতির সঙ্গে রামচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দেখিয়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে, বাংলার সঙ্গে রামের যোগাযোগ খুব প্রাচীন এবং গ্রাম বাংলার সঙ্গে এখনও রামচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। বাংলার বৈষ্ণব সংস্কৃতির ধারায় রামের অস্তিত্ব বিরাজমান। অন্যতম চৈতন্য জীবনীকার দয়ানন্দের নিজের পরিবার ছিল রামচন্দ্রের পরিবার। চৈতন্যদেবের বন্ধু মুরারী গুপ্ত নিজে ছিলেন রামভক্ত। রাঢ় বাংলার অন্যতম দেবতা হলেন ধর্মরাজ। এই ধর্মরাজপালায় বহু জায়গায় রামায়ণের গান হয়। এছাড়াও বাংলায় প্রচুর পরিমাণে টেম্পল কয়েন পাওয়া গেছে রামচন্দ্রকেন্দ্রিক।

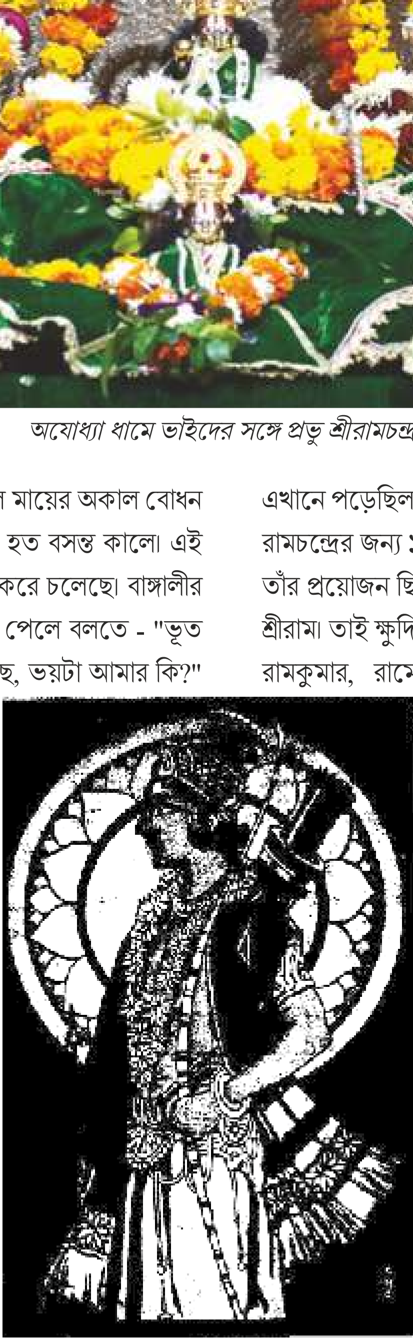

সচিত্র কৃত্তিবাসী রামায়ণে রামচন্দ্র, প্রকাশকঃ ইন্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড, ১৯৩২

কৃত্তিবাসী রামায়ণের ভূমিকা

বাঙালী পাঠক-সাধারণের কাছে কৃত্তিবাসী রামায়ণ নতুন করে পরিচয় করানোর অপেক্ষা রাখে না। প্রকৃতপক্ষে বাংলা একটি স্বতন্ত্র ভাষারূপে আত্মপ্রকাশ করার পর থেকে এ পর্যন্ত সব চাইতে বেশী পঠিত ও সমাদৃত গ্রন্থ কৃত্তিবাসী রামায়ণ —একথা বললে অত্যুক্তি হবে না। সেই সঙ্গে একথাও অনস্বীকার্য যে 'ভাষাপথ খননি স্ববলে' যাঁরা বাংলাভাষাকে সাহিত্যের মাধ্যমরূপে গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন কৃত্তিবাস সেই পূর্বসূরিগণের মধ্যে অন্যতম অগ্রগণ্য পথিকৃৎ। শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে বাঙালীর হৃদয়ে তাঁর আসন চিরকালের জন্য পাতা। সেই বঙ্গের অলঙ্কার 'কীর্তিবাস কবি' কৃত্তিবাসী অদ্বিতীয় রামায়ণ গ্রন্থখানি গীতা প্রেস থেকে শোভনরূপে সুমুদ্রিত করে পাঠককুলের কাছে উপস্থাপিত করতে পেরে আমরা আনন্দিত বোধ করছি ; আশা, তাঁরাও এই চিরন্তনের (ক্লাসিক) পর্যায়ভুক্ত সাহিত্যরত্নটি নতুনভাবে পেয়ে সাদরে গ্রহণ করবেন

কৃত্তিবাসী রামায়ণের ভূমিকা, গীতা প্রেস।

পঞ্চদশ-অষ্টাদশ শতকের এইসব মুদ্রা রাঢ় বাংলার মাটির তলা থেকেই পাওয়া গেছে। স্বপন কুমার ঠাকুর দেখিয়েছেন, বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষত শুধুমাত্র কাটোয়া মহকুমাতেই প্রায় ২০টি প্রাচীন রামচন্দ্রের বিগ্রহ আছে। - এতকিছুর পরেও যাঁদের মনে হয় যে রামচন্দ্র বঙ্গীয় সংস্কৃতির অংশ নয় - তাঁদের হয় বাঙ্গালী সংস্কৃতি সম্পর্কে কোন ধারণা নেই, নচেৎ তাঁরা জেনে বুঝে মিথ্যাচার করছেন।

আমরা জানি যে মধ্যযুগে বহিরাগত আক্রমণকারীদের দ্বারা হাজার হাজার হিন্দু-বৌদ্ধ-জৈন মন্দির ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং বহু জায়গাতেই পুরনো মন্দিরের ওপরেই মসজিদ নির্মিত হয়। ভারতবর্ষে মুঘল শাসনের প্রতিষ্ঠাতা বাবরের নির্দেশে তাঁর সেনাপতি মীর বাঁকি রাম জন্মভূমি অযোধ্যায় রামচন্দ্র সম্পর্কিত সমস্ত মন্দির ধ্বংস করে ১৫২৮-এ একটি মসজিদ স্থাপন করেন। এই মসজিদটি বাবরি মসজিদ নামে বেশি পরিচিত, কিন্তু ১৯৪০-এর দশকের আগে এটি পরিচিত ছিল 'মসজিদ-এ-জন্মস্থান' নামে। মসজিদটি একটি ছোট টিলার ওপর অবস্থিত- যার নাম 'রামকোট' (রামের দুর্গ)।

রামচন্দ্রের অকালবোধন।

ভারত সরকারের পদ্মশ্রী পুরস্কারে সম্মানীত ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ (ASI)-এর প্রাক্তন রিজিওনাল ডিরেক্টর (উত্তর) ও সুপারিন্টেনডেন্ট আর্কিওলজিস্ট প্রখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ কে. কে. মুহাম্মদ-এর নেতৃত্বে একটি দল অযোধ্যার বিতর্কিত জায়গায় উৎখনন চালিয়ে মসজিদের তলায় পুরনো স্থাপত্যের হদিস পান। মুহাম্মদ ২০১৬ তে মালায়লম ভাষায় প্রকাশিত তাঁর আত্মজীবনীতে (যার বাংলা অনুবাদ করলে দাঁড়ায় 'আমি একজন ভারতীয়') লেখেন যে, মার্ক্সবাদী ইতিহাসবিদরা কট্টরপন্থী মুসলিম গোষ্ঠীগুলিকে সমর্থন করায় অযোধ্যা বিতর্কের গ্রহণযোগ্য সমাধানে পৌঁছন কঠিন হয়ে পড়ে। মুহাম্মদ এই বইয়ে দাবী করেছেন, অযোধ্যায় হওয়া প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যে মসজিদের তলায় মন্দির থাকার পরিষ্কার প্রমাণ পাওয়া গেছে - কিন্তু বামপন্থী ইতিহাসবিদরা একে অস্বীকার করে এলাহাবাদ হাইকোর্টকে ভুল পথে চালানোর চেষ্টা করে। ২০০৩-এ 'ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ' এলাহাবাদ হাইকোর্টে রিপোর্ট জমা দেয় যে, মসজিদের নীচে খ্রীষ্টীয় দশম শতকের একটি স্থাপত্য রয়েছে। এবং ঐ অঞ্চলটিতে অন্তত ৩৩০০ বছর আগে থেকে মানুষ বসবাস করত। এবং অন্তত ১০০০ বছরের পুরনো স্থাপত্যের ওপর এই মসজিদটি খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতকের প্রথম দিকে তৈরী করা হয়। ২০১০-এ তার রায়ে এলাহাবাদ হাইকোর্ট ASI-এর এই সন্ধানকে মান্যতা দিয়ে মেনে নেয় যে, ঐ জায়গাটিতে একটি বৃহদাকার হিন্দু ধর্মীয় স্থাপত্য ছিল।

অযোধ্যার বিবদমান জায়গাটি বিগত কয়েক শতক ধরে অসংখ্য সংঘর্ষ প্রত্যক্ষ করেছে। উনবিংশ শতকেও ব্রিটিশ কোর্টে ঐ জায়গাটির দখল নিয়ে মামলা চলে। স্বাধীনতার পর থেকেই ভারতবর্ষের বিভিন্ন আদালতে এই নিয়ে মামলা চলছে। সুপ্রিম কোর্ট ২০১৯-এর ৯ই নভেম্বর তার ১০৪৫ পাতার রায়ে বলেছে, ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ-এর উৎখনন থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, "মসজিদটি খালি জমিতে তৈরী হয়নি। একটি অ-ইসলামিক কাঠামোর অস্তিত্ব মসজিদের তলায় পাওয়া গেছে।" সুপ্রিম কোর্ট তার রায়ে ঐ তথাকথিত 'বিতর্কিত' ২.৭ একর জমি রামলালার বলে মেনে নিয়েছে। এই ২০২৪ সালের জানুয়ারি মাসে কোটি কোটি ভারতীয়-র বিশ্বাস মর্যাদা লাভ করতে চলেছে এবং শতকের পর শতক ধরে বহু মানুষ অযোধ্যায় রামচন্দ্রের জন্মস্থানে রামমন্দির পুনর্নির্মাণের জন্য হাসিমুখে যে আত্মত্যাগ স্বীকার করেছেন- তাও ফলবান হতে চলেছে।

আজকের সন্দেশখালি আগামীর নোয়াখালি নয় তো?

স্বাতী সেনাপতি

সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে তৃণমূল নিজের লাভের জন্য শাজাহানের মত মাসলম্যান তৈরি করে রেখেছে। এদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হল, ভোটে সন্ত্রাস করে তৃণমূলকে জেতানো এবং সীমান্তে মুসলিম অনুপ্রবেশ ঘটানো। এই মুসলিম অনুপ্রবেশকারীরা ধীরে ধীরে পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত লাগোয়া জেলাগুলিতে ডেরা বাঁধছে। বদলে যাচ্ছে ডেমোগ্রাফি। তারপর সংখ্যাধিক্য হলেই সেখান থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছে হিন্দুদের! পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত লাগোয়া ১৪টি জেলায় মুসলিম জনসংখ্যা ৭০% এর বেশি। কোচবিহার থেকে বসিরহাট সর্বত্রই একই চিত্র।

দিনটা ছিল ১০ই অক্টোবর, ১৯৪৬ সাল। সেদিনও ছিল লক্ষীপুজো!
চাল গুড় নারকেল নাড়ু পদ্মফুল উলু শঙ্খধ্বনী ~
কোজাগরী সন্ধ্যেয় মা লক্ষ্মীর আরাধনা!

তার বদলে অবিভক্ত বাংলায় পাকিস্তানপন্থীদের দ্বারা নৃশংস হিন্দুনিধনের সাক্ষী ছিল কোজাগরীর চাঁদ!

রাস্তা হয়ে উঠেছিল রক্তে রাঙা। রাস্তার পাশে স্তূপীকৃত হিন্দুদের লাশ! বাতাস ভারী হয়ে উঠেছিল হিন্দুদের বাড়িঘর, গোয়াল, ধানের গোলা আর মানুষ পোড়ার বীভৎস গন্ধে। এই পুরো হিন্দু নিধন যজ্ঞের মাস্টার মাইন্ড ছিল মুসলিম লীগ। গুজব ছড়িয়ে দিয়ে কিভাবে পূর্ব পাকিস্তানকে হিন্দু শূন্য করে দেওয়া যায় তার পরিকল্পনা হয়েছিল অনেক আগেই। বিশ্বের ইতিহাসে অন্যতম বীভৎস গণহত্যা এই নোয়াখালি হিন্দু গণহত্যা।

গণহত্যা চলেছিল ৪ সপ্তাহ ধরে। সরকারি হিসেবে ৫০০০-এর বেশি হিন্দুকে হত্যা করা হয়। বেসরকারি হিসেবে সংখ্যাটা অন্তত কয়েকগুণ বেশি। ধর্ষিতা হয়েছিলেন হাজার হাজার হিন্দু রমণীও। জোর করে ধর্মান্তরিত করা হয় হাজার হাজার হিন্দুকে। রাতারাতি নিজের ভিটে মাটি ছেড়ে উদ্বাস্তু হয়ে যেতে হয় লক্ষাধিক হিন্দুকে। শুধুমাত্র কলকাতাতেই উদ্বাস্তুদের জন্য খোলা হয়েছিল ৬০টি আশ্রয় শিবির। এই ঘটনা আমরা সবাই জানি। পড়তে পড়তে শিউরেও উঠি। কিন্তু যেটা আমরা জানি না সেটা হল পশ্চিমবঙ্গের বুকেও কিন্তু একটু একটু করে দানা বাঁধছে নোয়াখালি।

কিছুদিন আগেই রেশন কেলেঙ্কারিতে অভিযুক্ত সন্দেশখালির বেতাজ বাদশা শাহজাহানের বাড়িতে তল্লাশি ও তদন্তের জন্য যায় ইডি আধিকারিকরা। তারপরের ঘটনা আমাদের সবার জানা। ইডি আধিকারিকদের ঘিরে ধরে একযোগে আক্রমণ, আক্রমণের সামনের সারিতে মহিলাদের এগিয়ে দেওয়া এবং ইডি আধিকারিকদের মাথা ফাটিয়ে দেওয়া! যে আচরণ কোনও সভ্য দেশের সভ্য নাগরিকদের থেকে একেবারেই কাম্য নয় সেটা দেখলাম আমরা। প্রসঙ্গত বলে রাখা দরকার বিগত কয়েক বছর ধরেই দেশজুড়ে দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযানে নেমেছে ইডি। জায়গায় জায়গায় প্রতিদিনই চলছে তল্লাশি। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল থেকে কংগ্রেস বিধায়ক, ব্যবসায়ী থেকে তৃণমূলের বহু নেতা, বাদ যাননি কেউই। কিন্তু কোথাও এই ধরণের পরিস্থিতি হয়নি।

এমনকি তৃণমূলের হেভিওয়েট নেতারা যেমন পার্থ, অনুব্রত, জ্যোতিপ্রিয়কে গ্রেফতার করতে গিয়েও এমন সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়নি ইডিকে। তাহলে প্রশ্ন উঠতে পারে শেখ শাহজাহানের ক্ষেত্রে কেন এই ঘটনা ঘটল? কয়েক মিনিটের মধ্যে ৭০০-৮০০ লোক জোগাড় করে হামলা করাও চাট্টিখানি কথা নয়! কিসের জোরে এই স্পর্ধা দেখাতে পারল শাহজাহানের সেপাইরা? ২৭% এর জোরেই কি? এর উত্তর খুঁজতে হলে আমাদের দেখতে হবে কিভাবে পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী এলাকাগুলোর পাশাপাশি সমগ্র রাজ্যেই ধীরে ধীরে ডেমোগ্রাফিক পরিবর্তন হয়ে চলেছে। দেখতে হবে কিভাবে সীমান্তে মুসলিম জনসংখ্যার বিস্ফোরণ ঘটছে অনুপ্রবেশের ফলে।

মুসলিম জনসংখ্যার নিরিখে, সরকারি হিসেবে এই মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গ রয়েছে চতুর্থ স্থানে। ভারতবর্ষের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে সবথেকে দীর্ঘ সীমানা ভাগ করে নেয়। এই ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের বহু জায়গাই পোরাস বা ছিদ্রাল। পোশাকি ভাষায় বলতে গেলে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের বেশ অনেকটা অংশই স্থলভাগ দিয়ে নয় জলভাগ দিয়ে

সন্দেশখালিতে তৃণমূল নেতা শাহজাহানের লেলিয়ে দেওয়া উন্মত্ত জনতা।

শেখ শাহজাহানের গ্রেফতারের দাবিতে বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের নেতৃত্বে ন্যাজাট থানা ঘেরাও।

বেষ্টিত। কেন্দ্রীয় সরকার একাধিকবার ফেন্সিংয়ের বিষয়ে উদ্যোগী হলেও রাজ্য সরকার তা বারংবার নাকচ করে গিয়েছে। আর এই সুযোগটাই কাজে লাগাচ্ছে মুসলিম অনুপ্রবেশকারীরা। ধীরে ধীরে পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত লাগোয়া জেলা গুলিতে ডেরা বাঁধছে এরা। বদলে যাচ্ছে ডেমোগ্রাফি। তারপর সংখ্যাধিক্য হলেই সেখান থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছে হিন্দুদের ! পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত লাগোয়া ১৪টি জেলায় মুসলিম জনসংখ্যা ৭০% এর বেশি। কোচবিহার থেকে বসিরহাট সর্বত্রই একই চিত্র।

এখানেই শেখ শাহজাহানের মত নেতাদের গল্পটা আসে। সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে তৃণমূল নিজের লাভের জন্য শাজাহানের মত মাসলম্যান তৈরি করে রেখেছে। সিপিএমের আমলে মজিদ মাস্টার থেকে হালফিলের আরাবুল, শাজাহান। সংখ্যাটা বেড়েছে বই কমেনি। এই শাজাহানের মত নেতারা ভোটে সন্ত্রাস করে তৃণমূলকে জেতানো থেকে বোমা শিল্পের উদঘাটন করা সবেতেই সিদ্ধহস্ত ! এদের আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হল সীমান্তে অনুপ্রবেশ ঘটানো। মোটা টাকার বিনিময়ে দুই বাংলায় এজেন্ট রেখে রীতিমত চলে এই ব্যবসা। এপারে এলেই প্রথম কাজ হয় ভুয়ো ভোটার কার্ড, রেশন কার্ড, আধার কার্ড বানিয়ে দেওয়া। জায়গায় জায়গায় এরকম ভুয়ো কারবার ধরা পড়লেও সেটা হিমশৈলের চূড়া মাত্র। ভুয়ো আধার, ভোটার নিয়ে এরা মিশে যাচ্ছে আমার, আপনার মধ্যে। বসতি স্থাপন করছে, ভোট দিয়ে তৃণমূলকে জেতাচ্ছে, আন্দোলনের নামে ট্রেন, বাস জ্বালিয়ে দিচ্ছে, ভাগ বসাচ্ছে আপনার , আমার খাদ্য, বাসস্থান, চাকরি, উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ অর্থে। তারপর ভিটে মাটি ছাড়া করছে সীমান্তের হিন্দুদের। আর এসবই ঘটছে পর্দার আড়ালে। শুধু মাঝে মাঝে এদের শ্বদন্ত ঝলসে ওঠে! পুজো-পার্বণে হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি ভাঙা, পুজোর উপর ফতোয়া জারি করার পাশাপাশি ইডি আধিকারিকদের গায়ে হাত তোলা। এগুলো বিক্ষিপ্ত ঘটনা হলেও বিক্ষিপ্ত কিন্তু নয়। যারা মিনিট খানেকের মধ্যে ৭০০ লোক নিয়ে এসে কেন্দ্রীয় নিরাপত্তারক্ষীদের দৌড় করাতে পারে, ইডি আধিকারিকদের গায়ে হাত তুলতে পারে তারা যে আবারও কোনও সামান্য গুজবে আর একটা নোয়াখালি বা গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং ঘটিয়ে দেবে না তার ভরসা আছে কি?

ডিএ চুরির সরকার আর নেই দরকার

অভিরূপ ঘোষ

হিসাব বলছে বিজেপি শাসিত কেন্দ্রীয় সরকার বর্তমানে ৪৬ শতাংশ ডিএ দেয় নিজের কর্মীদের। সেই রাস্তাতেই হেঁটে গুজরাট, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, ওড়িশা সমেত অধিকাংশ বড় রাজ্য হয় ৪৬ শতাংশ নয় তার থেকে অল্প কিছু কম ডিএ দেয়। এমনকি অরুণাচল প্রদেশ বা গোয়ার মত ছোট রাজ্যও কেন্দ্রের সমান ডিএ দেয় আজকের দিনে দাঁড়িয়ে। সেখানে সবকিছুতেই এক নম্বরে দাবি করা মমতা ব্যানার্জির সরকার এখন মহার্ঘ্য ভাতা দেয় দশ শতাংশ, যা গোটা দেশের নিরিখে সবথেকে কম।

"যে সরকার কর্মচারীদের প্রাপ্য ডিএ দিতে পারে না সেই সরকারের ক্ষমতায় থাকার কোনও অধিকার নেই।" বক্তব্যের স্থান কলকাতায় সরকারি কর্মচারীদের সভা। কাল ২০০৯-২০১০। পাত্রী মমতা ব্যানার্জী, তৎকালীন বিরোধী নেত্রী। আর আজ! সরাসরি বলে দিচ্ছেন ডিএ ঐচ্ছিক, ইচ্ছা হলে তিনি দেবেন আর না হলে দেবেন না। অথচ আজকের সময়ে দাঁড়িয়েও আদালতের শেষতম রায় বলছে ডিএ কর্মচারীদের অধিকার। অবশ্য এটাও সত্যি যে মমতা ব্যানার্জি আইন-আদালত বা নিয়ম কানুন মেনে চলছেন এ দৃশ্য ভারতীয় রাজনীতিতে বিরল।

ডিএ অর্থাৎ মহার্ঘ্য ভাতা কখনোই কোনও সরকারের নিজস্ব ইচ্ছা বা মর্জির ওপর চলে না। এর জন্য দেশব্যাপী একটা নির্দিষ্ট পদ্ধতি আছে যা AICPI বা সর্বভারতীয় মূল্য সূচকের উপর নির্ভর করে চলে। সোজা ভাষায় বলতে গেলে মুদ্রাস্ফীতি বা মূল্যবৃদ্ধি যেমন যেমন হয় মহার্ঘ্য ভাতাও তেমন

বকেয়া ডিএ-র আন্দোলনে চাপে নবান্ন।

তেমন বাড়ে। ডিএ কোনওদিনই কর্মচারীদের অতিরিক্ত সুবিধা দেওয়া নয়, বরং মূল্যবৃদ্ধিকে প্রশমিত করে ক্রয়ক্ষমতা ও আর্থিক অবস্থাকে ধরে রাখার একটা পদ্ধতি। তাই সাধারণত বছরে দু'বার AICPI অনুযায়ী মহার্ঘ্য ভাতা ঘোষণা করে কেন্দ্রীয় সরকার সহ অধিকাংশ রাজ্য। অধিকাংশ রাজ্য, অবশ্যই পশ্চিমবঙ্গ নয়।

হিসাব বলছে বিজেপি শাসিত কেন্দ্রীয় সরকার বর্তমানে ৪৬ শতাংশ ডিএ দেয় নিজের কর্মীদের। সেই রাস্তাতেই হেঁটে গুজরাট, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, ওড়িশা সমেত অধিকাংশ বড় রাজ্য হয় ৪৬ শতাংশ নয় তার থেকে অল্প কিছু কম ডিএ দেয়। এমনকি অরুণাচল প্রদেশ বা গোয়ার মত ছোট রাজ্যও কেন্দ্রের সমান ডিএ দেয় আজকের দিনে দাঁড়িয়ে। সেখানে সবকিছুতেই এক নম্বরে দাবি করা মমতা ব্যানার্জির সরকার এখন মহার্ঘ্য ভাতা দেয় দশ শতাংশ, যা গোটা দেশের নিরিখে সবথেকে কম। উল্লেখ্য যে রাজ্যে দশ শতাংশ মহার্ঘ্য ভাতা শুরু হচ্ছে নতুন বছরের জানুয়ারি থেকে। ২০২৩ সালের ডিসেম্বর অব্দি এরাজ্যে ডিএ ছিল মাত্র ছয় শতাংশ। অর্থাৎ কর্মচারীদের আন্দোলনের জেরে 'ভিক্ষার মত' অল্প কিছু বৃদ্ধি করতে বাধ্য হলেও মমতা সরকারের কর্মীরা প্রায় ৩৬ শতাংশ বেতন কম পায় অন্য সবার থেকে।

আশ্চর্যের কথা হল কর্মচারী মহল আর গুটিকয়েক মননশীল মানুষ ছাড়া অনেকেই এই বিষয়ে ভীষণ রকম উদাস। প্রযত্নে তৃণমূল কংগ্রেস। দিনের পর দিন মমতা ব্যানার্জি সহ তৃণমূলের ছোট বড় নেতারা গণশত্রুতে পরিণত করে দিয়েছে সরকারি কর্মচারী এবং শিক্ষক অধ্যাপকদের। যে কোনও সরকার তথা রাজ্য বা রাষ্ট্রের মেরুদন্ড হল সরকারি কর্মচারী - শিক্ষক - ডাক্তাররা। অথচ তৃণমূল নেতাদের ভাব এমন যেন রাজ্য সরকারী কর্মীরা কোন কাজ না করেই গাদা গাদা টাকা সরকারি কোষাগার থেকে আত্মসাৎ করছে। সেটাই যদি হয় তবে অবধারিত ভাবে প্রশ্ন ওঠে তাহলে সরকারি কাজগুলো করছে কারা! স্কুলগুলোয় পড়ানো সমেত বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণ কাদের দ্বারা হচ্ছে! হাসপাতালে চিকিৎসা করছে কারা! মমতা ব্যানার্জি দাবি করেন তিনি সবেতেই নাম্বার ওয়ান। তাই যদি হয় তবে তার কৃতিত্ব ১০০% সরকারি কর্মচারীদের হওয়া উচিত। মাথায় রাখতে হবে নিয়োগ এক প্রকার বন্ধ করে দেওয়ায় অফিসে কর্মচারী কম, স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক কম, হাসপাতালে ডাক্তার-নার্স কম। বিভিন্ন প্রকল্পের অধিকাংশ টাকা তৃণমূল নেতাদের পকেটে চলে যায়। যেটুকু পড়ে থাকে তা দিয়ে জোড়াতালি দেওয়া ব্যবস্থাটা চালাচ্ছেন তো সেই কর্মচারীরাই! একটা গোটা শিক্ষা দপ্তর জেলে। নেতা মন্ত্রী সহ জোর করে চেয়ারে বসিয়ে দেওয়া পদাধিকারী গারদের হাওয়া খাচ্ছেন। তবু ক্লাস হচ্ছে, পরীক্ষা হচ্ছে, মিড ডে মিল চলছে। প্রয়োজনীয় কম কর্মী নিয়েও চালাচ্ছেন তো সেই শিক্ষকরাই! তাহলে তাঁরা তাদের প্রাপ্য ডিএ পাবেন না কেন!

সরকার বলছে রাজ্যের কোষাগারের অবস্থা খারাপ। এদিকে বিধায়ক মন্ত্রীদের বেতন বেড়ে যাচ্ছে কয়েক গুন (যদিও প্রধান বিরোধী দলের বিধায়করা বর্ধিত বেতন নেবেন না বলে জানিয়েছেন)। তৃণমূল নেতাদের বাড়ি থেকে উদ্ধার হচ্ছে কোটি কোটি টাকা। আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত তৃণমূল ঘনিষ্ট লোকজনকে প্রচুর বেতন ও সুবিধা দিয়ে বসিয়ে দেওয়া হচ্ছে বিভিন্ন অপ্রয়োজনীয় পদে। তারপরেও কোষাগারের অবস্থা নাকি খারাপ! এদিকে খেলা-মেলা-উৎসবের কোনও কমতি নেই। লক্ষণীয় বিষয় হল এগুলো সবই তৃণমূলের বিভিন্ন স্তরের ব্যবসাদার-কন্ট্রাকটর সহ শিল্পীদের পাইয়ে দেওয়ার খেলা। প্রকৃত যোগ্য লোকেদের বঞ্চিত করে নিজেদের লোকেদের পকেট ভরানোর মাধ্যম এটা। বছরের পর বছর এদের পসার বাড়ে (কলকাতা থেকে জেলা হয়ে এখন ব্লক অব্দি)। তার বেলায় কিন্তু টাকার কমতি নেই। শুধু কর্মীদের ন্যায্য পাওনা দেবার বেলায় টাকা কম পড়ে যায়। অথচ তথ্য বলছে যেসব রাজ্য পুরো ডিএ দেয় তাদের অনেকের চেয়ে অনেক বেশি টাকা কেন্দ্রের থেকে পেয়েছে আমাদের রাজ্য।

আর এখানেই মমতা ব্যানার্জির থেকে শেখা মিথ্যা বুলি আওড়াতে শুরু করে তৃণমূল নেতারা। সেই চিরাচরিত 'কেন্দ্রীয় বঞ্চনা'র তত্ব যা এক সময় বামেদেরও রাজনৈতিক হাতিয়ার ছিল। ঘটনা হল, কেন্দ্রের থেকে এক পয়সাও অর্থ পাওয়া বাকি নেই রাজ্যের। রাজ্য যেটা বলে সেটা সম্পূর্ন মিথ্যে কথা। কেউ অন্যায় দাবি করলেই সেটা তার প্রাপ্য হয়ে যায় না। তাছাড়া নিয়ম অনুযায়ী এক প্রকল্পের টাকা অন্য প্রকল্পে খরচ করা যায় না। আর বেতন খাতে রাজ্যের কোষাগার থেকে আলাদা অর্থ বরাদ্দ থাকে। রাজ্যের দাবি মত কেন্দ্র

ডিএ আন্দোলনকারীদের পাশে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

যদি কিছু অতিরিক্ত অর্থ দিয়েও দেয় তবে তা বেতন খাতে বরাদ্দ করার কোন নিয়ম নেই। তাই কেন্দ্র টাকা দিচ্ছে না বলে ডিএ দেওয়া যাচ্ছে না এই যুক্তি ধোপে টেকে না। হিসাব বলছে কর্মচারীদের বেতন খাতে বরাদ্দ, রাজ্য শেষ দশ বছরে সেভাবে বাড়ায়নি। আর যেটুকু বরাদ্দ থাকে তারও সবটা ঠিকঠাকভাবে খরচা হয় না। হিসাব পরিষ্কার, অমানবিক মুখ্যমন্ত্রী ইচ্ছা করেই ডিএ দেন না। তিনি এবং তার সাগরেদরা বলে বেড়ান যে ডিএর থেকে লক্ষীর ভান্ডার বা কন্যাশ্রী প্রকল্প অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। বাস্তব সত্য হল বেতন খাতে বরাদ্দের সঙ্গে এই প্রকল্পগুলোর কোন সম্পর্কই নেই। সেটাই যদি হত তবে তো বলতে হয় প্রকল্পগুলো চলছে সরকারি কর্মচারীদের টাকায়! সেটা যখন নয় তখন কিভাবে তৃণমূল ডিএ আর প্রকল্পগুলো মিলিয়ে ফেলে! সাধারণ মানুষের চোখে শিক্ষক-কর্মচারীদের ছোট করা এর অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। বাস্তব সত্য এটাই যে সরকারিভাবে দুটো একেবারে ভিন্ন বিষয়। অর্থাৎ কর্মচারীদের ন্যায্য ডিএ দেবার সাথে সাথেই সরকার চাইলে আরো ভালোভাবে এই প্রকল্পগুলোকে চালাতে পারে। কিন্তু সরকার না কর্মচারীদের ডিএ

দেবে, না এই প্রকল্পগুলো সৎ ভাবে চালাবে। উল্টে আদালত যখন রায় দেবে যে ডিএ কর্মচারীদের অধিকার, তখন সেই রায়কে আটকাতে কোষাগারের কোটি কোটি টাকা খরচ করে ছুটবে সুপ্রিম কোর্টে। সঙ্গী অতি অবশ্যই সিপিএম আর কংগ্রেসের কিছু স্বঘোষিত উকিল কাম আইনি দালাল।

কেউ ভাবতেই পারেন রাজ্য সরকারি কর্মচারী তথা শিক্ষক-অধ্যাপক-ডাক্তারদের সংখ্যা তো মোট জনসংখ্যার নিরিখে দুই শতাংশেরও কম। তাহলে তাদের কথা সরকার ভাবতে যাবে কেন! এর উত্তর বিবিধ। প্রথম কথা সরকারি কর্মচারী তো বটেই, রাজ্যের প্রতিটি মানুষের কথা ভাবাই সরকারের কাজ। তাছাড়া শতাংশের হিসাবে বিচার হলে তৃণমূল তো গোটা দেশের নিরিখে এক শতাংশে দাঁড়িয়ে। কিন্তু তাবলে তো কেন্দ্র হিসাবমত টাকা দেওয়া বন্ধ করে দেয়নি! দ্বিতীয়ত সরকারি কর্মচারী-শিক্ষক-অধ্যাপক-ডাক্তাররা গোটা প্রশাসন তথা রাজ্যের মেরুদন্ড স্বরূপ। তাই শূন্য পদে নিয়োগ এবং কর্মচারীদের ন্যায্য ডিএ না দেওয়া হলে গোটা ব্যবস্থাটা ভেঙে পড়ার সমূহ সম্ভাবনা। তৃতীয়ত অসংগঠিত ক্ষেত্রের কর্মচারীদের বেতন অনেকাংশে নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের ডিএর উপর। যে রাজ্যের কর্মচারীদের ডিএ অন্যদের থেকে বেশি সেই রাজ্যের সমস্ত অসংগঠিত কর্মীর বেতন বাকিদের থেকে বেশি। একটু খেয়াল করলে দেখা যায় গুজরাট, রাজস্থান, মহারাষ্ট্র বা তামিলনাড়ুতে কোন কর্মীর বেতন পশ্চিমবঙ্গের বেসরকারি এবং অসংগঠিত কর্মীর তুলনায় অনেকটাই বেশি। চতুর্থত তৃণমূল নেতাদের পকেটে টাকা গেলে তা সাধারণ মানুষের কোন কাজে লাগে না। তা জমা হয় বিদেশের ব্যাঙ্কে কিংবা লকারে। বা রিয়েল এস্টেটে (এর জন্যই দাম বাড়ে ঝড়ের গতিতে)। কিন্তু কর্মীরা ন্যায্য বেতন পেলে তার অধিকাংশই খরচ হয় বাজারে। ফলে সামান্য ফল বিক্রেতা থেকে আরম্ভ করে ছোট বড় ব্যবসায়ীরা পরোক্ষভাবে উপকৃত হন।

এক চরম দুর্নীতিগ্রস্থ সরকার চালাচ্ছেন মমতা ব্যানার্জি। চাল-ত্রিপল-চাকরি চুরির সাথে সাথে কর্মচারীদের মহার্ঘ্য ভাতা চুরি তার অন্যতম অংশ। এখন দেখার এই অন্যায় আর দুর্নীতির শেষ কোথায়!

নাছোড় আন্দোলনে জমি হারাচ্ছে পিসি-ভাইপোর সরকার।

বকেয়া ডিএ-র দাবিতে মমতা, অভিষেকের পাড়ায় মিছিল।

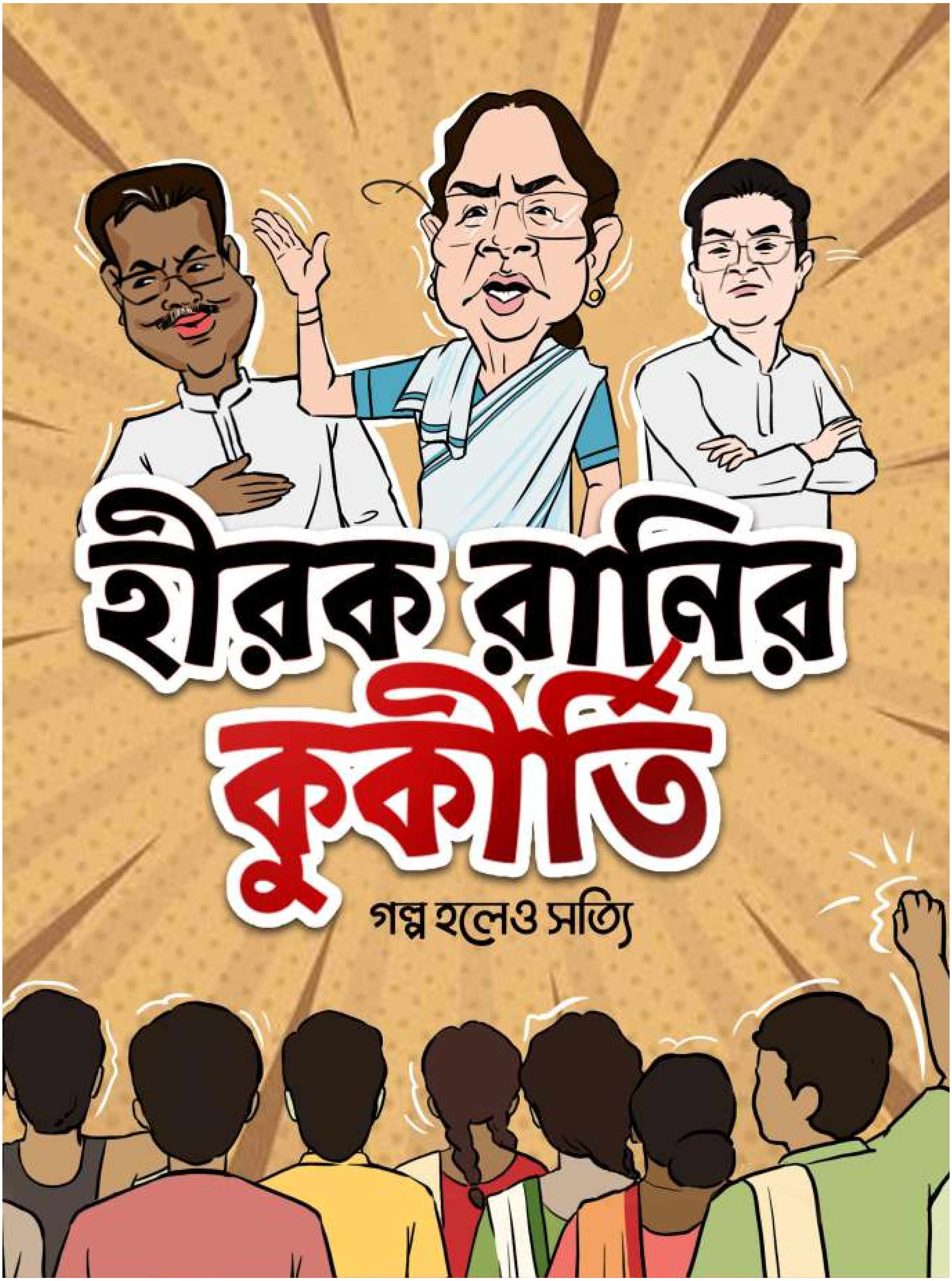
হীরক রানির
কুকীর্তি
গল্প হলেও সত্যি

পর্ব – ১

হীরক রানির তোষণ নীতি

ছবিতে খবর

কলকাতার গুরদ্বার শ্রী বড় শিখ সঙ্গত সাহিব দর্শনে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী অমিত শাহজী, বিজেপি সর্বভারতীয় সভাপতি শ্রী জেপি নাড্ডা জী এবং রাজ্য বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদার।

কলকাতায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ জী এবং বিজেপি সর্বভারতীয় সভাপতি শ্রী জেপি নাড্ডা জীর উপস্থিতিতে, আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির কোর গ্রুপের বৈঠক।

কলকাতায় প্রদেশ পদাধিকারী বৈঠকে বিজেপির কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য নেতৃত্ব।

কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারে বিজেপি সোশ্যাল মিডিয়া ভলেন্টিয়ার্স মিট -এ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ জী, বিজেপি সর্বভারতীয় সভাপতি শ্রী জেপি নাড্ডা জী সহ রাজ্য নেতৃত্ব।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ জী এবং বিজেপি সর্বভারতীয় সভাপতি শ্রী জেপি নাড্ডা জী সহ বিজেপি নেতৃত্ব কালীঘাট শক্তিপীঠ দর্শন করলেন ও পূজা দিলেন।

শ্রী রাম লালার প্রত্যাবর্তনে জোড়াসাঁকো বিধানসভার ২৩ নম্বর ওয়ার্ডে বাড়ি-বাড়ি জনগণকে অযোধ্যায় যাওয়ার নিমন্ত্রণ জানাচ্ছেন রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) অমিতাভ চক্রবর্তী।

বিধায়কদের সঙ্গে নিয়ে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর আচমকা নবান্ন অভিযান।

কলকাতায় ICCR প্রেক্ষাগৃহে পশ্চিমবঙ্গ মোর্চা সংযুক্ত সম্মেলনে রাজ্য নেতৃত্ব ও কর্মীবৃন্দ।

হুগলি জেলার প্রধানমন্ত্রী বিশ্বকর্মা যোজনার পর্যালোচনা বৈঠকে রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়।

বিজেপি পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের লোকসভা নির্বাচন যোজনা বৈঠকে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য নেতৃত্বগণ।

ব্রিগেডে লক্ষ কণ্ঠে গীতা পাঠের অনন্য মুহূর্ত

বিজেপি হাওড়া গ্রামীণ জেলার পদাধিকারীদের সঙ্গে বিশেষ সাংগঠনিক বৈঠকে রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) অমিতাভ চক্রবর্তী।

বিজেপি জলপাইগুড়ি সাংগঠনিক জেলায়, 'চোর ধরো - জেল ভরো' বিক্ষোভ মিছিলে রাজ্য সভাপতি ডঃ সুকান্ত মজুমদার, সাংসদ ডাঃ জয়ন্ত রায়, বিজেপি বিধায়কগণ সহ জেলা নেতৃত্ব এবং কর্মীবৃন্দ।

চোর মুক্ত বাংলা গড়ার লক্ষ্যে পুরুলিয়ার ঝালদায় বিজেপির প্রতিবাদ সভায় বিরোধী দলনেতা শ্রী শুভেন্দু অধিকারী।

বঞ্চিতদের অধিকার আদায়ের দাবিতে বিজেপির ডাকে ওন্দা বিডিও অফিস ঘেরাও এবং ডেপুটেশন কর্মসূচিতে মহিলাদের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়।

ব্যারাকপুর সাংগঠনিক জেলায় সিদ্ধেশ্বরী কালিমাতা মন্দিরে অন্নকূট অনুষ্ঠানে বিজেপি রাজ্য সভাপতি ডঃ সুকান্ত মজুমদার।

সম্মানীয় উপরাষ্ট্রপতি শ্রী জগদীপ ধনখড়ের প্রতি তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবমাননাকর আচরণের প্রতিবাদে শ্রীরামপুর সাংগঠনিক জেলায় প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ কর্মসূচিতে বিরোধী দলনেতা শ্রী শুভেন্দু অধিকারী, সাংসদ লকেট চ্যাটার্জী সহ জেলা নেতৃত্ব এবং কর্মীবৃন্দ।

স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন উপলক্ষে গঙ্গারামপুর থেকে বালুরঘাট পর্যন্ত বাইক র‍্যালিতে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সভাপতি ডঃ সুকান্ত মজুমদার।

স্বামী বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে কলকাতায় 'বিকশিত ভারত দৌড়ে' অংশগ্রহন করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, জাতীয় যুবমোর্চা নেতা শক্তি সিংহ এবং রাজ্য যুবমোর্চা সভাপতি ডাঃ ইন্দ্রনীল খান।

জাতীয় যুব দিবস উদযাপনে, 'বিকশিত ভারত দৌড়ে' শিলিগুড়িতে যুবমোর্চার কার্যকর্তারা।

গঙ্গা সাগর মেলাতে গঙ্গা স্নান ও কপিল মুনির কাছে পুজো দিয়ে বিনামূল্যে চিকিৎসা শিবির চালু করলেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি ডঃ সুকান্ত মজুমদার।

পুলিশি অপদার্থতা, তৃনমুল নেতাদের দেশবিরোধী ও বিচ্ছিনতাবাদী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে বসিরহাট সাংগঠনিক জেলার ন্যাজাট থানা ঘেরাও অভিযানে রাজ্য সভাপতি ডঃ সুকান্ত মজুমদার সহ অন্যান্য নেতৃত্ববৃন্দ।

টাকিতে বসিরহাট সাংগঠনিক জেলা শক্তিকেন্দ্র প্রমুখ সম্মেলনে রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) অমিতাভ চক্রবর্তী এবং বিজেপি নেতৃত্বগণ।

তিন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী

ভারতের রাজনীতিতে নতুন পথনির্দেশিকা

সৌভিক দত্ত

কাঠখড় না পোড়ালে, মাথার ঘাম পায়ে না ফেললে, ঠাণ্ডাঘর থেকে মাটিতে না নামলে যে বিজেপির রাজনীতি বোঝা সহজ নয় তা আরও একবার প্রমাণিত হল সম্প্রতি তিন রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে। ফলপ্রকাশ এবং ফলপ্রকাশের পরে মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচনের একঘন্টা আগেও মিডিয়া সহ ইন্ডিজোটের 'মহাজ্ঞানী'-রা আন্দাজ করতে পারেনি কি হতে চলেছে। ছত্তিসগড় এবং রাজস্থানের ফলাফল নিয়ে কল্পনাও করতে পারেনি 'মহাজ্ঞানী'-রা। এই তিন রাজ্যের নির্বাচন, নতুন ভারতে রাজনৈতিক চরিত্রকে আড়াআড়ি ভাবে দুভাগে ভাগ করে দিয়েছে। একদিকে সমাজের সর্বশেষ স্তর পর্যন্ত বিজেপির বুথ ভিত্তিক রাজনীতি। অন্যদিকে ইন্ডিজোটের মধ্যে থাকা রাজনৈতিক দলগুলির পারসেপশন বেসড রাজনীতি। যে রাজনীতিতে ক্ষমতায় টিকে থাকাই শেষ কথা, রাষ্ট্রনির্মানে ভবিষ্যতের রাজনৈতিক কারিগর তৈরি করার কোন ভাবনাই সেখানে নেই।

ভারতবর্ষের উন্নতির পথে যদি প্রধান দুটি বাধাকে চিহ্নিত করতে হয়, তবে অবশ্যই সেগুলো হল জাতপাত আর পরিবারতন্ত্র। জাতপাত নিয়ে তো নতুন করে নিশ্চয়ই কিছু বলার নেই। বছরের পর বছর ধরে এই কুপ্রথা ভারতকে ভেতর থেকে কুড়ে কুড়ে খেয়েছে। একদিকে যেমন আভ্যন্তরীণ একতাকে দুর্বল করেছে অন্যদিকে রাস্তা খুলে দিয়েছে বিদেশী আক্রমনের। আধুনিক যুগে যদিও কিছু মনীষী জাতপাত নির্মূলের চেষ্টা করলেন, কিন্তু হল তাতে হিতে বিপরীত। তাদের নাম ভাঙিয়ে নির্দিষ্ট কিছু মানুষ লাভের গুড় খেতে লাগল, অন্যদিকে বাকি কোটি কোটি মানুষ আগের মতোই শাসিত ও শোষিত হতে লাগল। যেমন উদাহরণ দেওয়া যায় আমাদের রাজ্যের কথাই। আজ পর্যন্ত যে কটি শাসক দল এখানে ক্ষমতায় এসেছে প্রত্যেকেই মুখে বলেছে জাতপাত নির্মূলের কথা কিন্তু তাদের কেউই নির্দিষ্ট দুটি 'কাস্ট'-এর বাইরে কোনো মুখ্যমন্ত্রী দিতে পারেনি। অর্থাৎ জাতপাত দূরীকরণের নামে আদতে মানুষের চোখে ধুলো দিয়ে জাতের

ছবি সৌজন্যঃ এবিসি নিউজ

রাজনীতিই চলেছে।

আর তার সঙ্গে আছে পরিবারতন্ত্র। ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সব ক্ষমতাই গিয়ে জড়ো হয়েছিল নির্দিষ্ট কয়েকটি পরিবারের হাতে। ইউরোপীয় দেশগুলো যেভাবে চীনকে ভাগবাটোয়ারা করে নিয়েছিল, এই পরিবারগুলোও একইভাবে আমাদের দেশকে ভাগ করে নিয়েছিল নিজেদের মধ্যে। উত্তরপ্রদেশকে লুঠ করবে অমুক পরিবার, তামিলনাড়ুকে লুঠ করবে তমুক পরিবার, কাশ্মীরকে ভোগদখল করবে একটি পরিবার, দিল্লিতে বসে ভারত লুঠবে অন্য আরেকটি পরিবার - একেবারে মানচিত্রে দাগ কেটে স্বচ্ছতার সঙ্গে ভাগবাটোয়ারা যাকে বলে আরকি।

আর এতে ক্ষতি কার হয়েছে? ক্ষতি হয়েছে এই দেশের, ক্ষতি হয়েছে এই দেশের মানুষের। শিক্ষিত-যোগ্য কোনো নেতৃত্ব উঠে আসেনি। কেউ প্রতিবাদ করতে চাইলে তাকে দমিয়ে দেওয়া হয়েছে। দেশের সম্পদ কুক্ষিগত হয়েছে নির্দিষ্ট কয়েকটি পরিবারের হাতেই। নতুন সম্পদ সৃষ্টির বদলে তা ব্যবহৃত হয়েছে পরিবারগুলোর বিলাসব্যসনে। এমনও পরিস্থিতি

ছত্তিসগড়ের প্রথম জনজাতি মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণু দেও সাই।

আর সেই নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে ভারতীয় সমাজে শুরু হয়েছিল "সবকা সাথ, সবকা বিকাশ" এর জন্য লড়াই, তা এবার অন্য মাত্রা পেলো ২০২৩-এর বিধানসভা নির্বাচনের পরে, বলা ভালো, বিধানসভা নির্বাচনগুলোতে ভারতীয় জনতা পার্টির অবিশ্বাস্য বিজয়ের ফলে। সবাইকে নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার যে রাস্তা নরেন্দ্র মোদি দেখিয়েছেন তা কায়েমি স্বার্থের কফিনে একরকম শেষ পেরেক ঠোকার মতোই।

এই পর্যায়ে বিজেপি নিরঙ্কুশ জয় পেয়েছে তিনটি রাজ্যে। রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ আর ছত্তিশগড়। শিবরাজ সিং চৌহান, বসুন্ধরা রাজে, রমন সিং- এরা সবাই এইসব রাজ্যে পার্টির গুরুত্বপূর্ণ নেতৃত্বে ছিলেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল প্রতিটি রাজ্যেই নতুন নেতৃত্বের হাতে ক্ষমতা তুলে দেওয়া হল। ভরসা করা হল নতুন নেতৃত্ব তুলে আনার পরীক্ষা-নিরীক্ষার উপরে। মধ্যপ্রদেশে মুখ্যমন্ত্রী হলেন মোহন যাদব, ছত্তিশগড়ে বিষ্ণু দেও সাই এবং রাজস্থানে ভজন লাল শর্মা।

উচ্চশিক্ষিত মোহন যাদব উজ্জয়িনী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞানের

গেছে যখন ভারতীয় বিশ্বকাপ দলের কাছে জুতো কেনারও টাকা নেই অথচ ভারতের এক পরিবারের কাপড় ড্রাই ক্লিনিং হয়ে আসত ইউরোপ থেকে। এক নেতার বিদেশে থাকা গার্লফ্রেন্ডকে লেখা চিঠি রাষ্ট্রীয় অর্থ খরচ করে পৌঁছে দিয়ে আসত এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান। মুঘল আর ব্রিটিশ যাওয়ার পর বস্তুত আরও কয়েকটি নব্য মুঘল আমাদের শোষন করেছে বছরের পর বছর! এবং ততদিন করে গিয়েছে যতদিন না ভারতের রাজনীতিতে নতুন সূর্যোদয় হয়েছে। পরিবারতন্ত্রের চোখে চোখ রেখে শাসন ক্ষমতায় উঠে এসেছে মামুলি এক চা ওয়ালার ছেলে, ক্ষমতায় এসেছেন নরেন্দ্র মোদি। বস্তুত এই ২০১৪ থেকেই মৃত্যুঘন্টা বেজে গিয়েছিল ভারতের এই দুই অভিশাপের - জাতের রাজনীতি আর পরিবারতন্ত্র!

নরেন্দ্র মোদি নিজে একজন স্বয়ংসেবক। যে স্বয়ংসেবকদের ক্যাম্প (বর্গ) দেখতে গিয়ে গান্ধীজি অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। হাজারো মিটিং-মিছিল-বক্তৃতা করে যে জাতপাতকে তিনি মানুষের মন থেকে মুছতে পারেননি তা কোন মন্ত্রবলে স্বয়ংসেবকদের মন থেকে সম্পূর্ণ উপড়ে ফেলেছে এই সংগঠন যে জাতপাত নির্বিশেষে সবাই একইসাথে বসে খাচ্ছে। সময়টা বিংশ শতকের প্রথমার্ধের মহারাষ্ট্র, আমাদের মনে রাখা উচিত। তাছাড়া নরেন্দ্র মোদি জন্মসূত্রে পিছিয়ে পরা সম্প্রদায় (OBC) থেকে লড়াই করে উঠে আসা মানুষ। তাই তার বাধ্যবাধকতা ছিলই জাতের কায়েমি স্বার্থ ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সবার সামনে সমান সুযোগ এনে দেওয়ার! আর তিনি সেটাই করেছেন। ২০১৪ এর পরে ভারত পেয়েছে একজন দলিত ও একজন জনজাতি রাষ্ট্রপতি। এবং তারা এই পদে এসেছেন নিজেদের যোগ্যতায়, কোনো পরিবারকে তোষামোদ করে নয়। শোষিত সমাজের পুনরুত্থানের ইতিহাসে এ কিন্তু কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী ভজনলাল শর্মা।

শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মোহন যাদব

গ্র্যাজুয়েট (B.Sc) হন। তারপর একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এলএলবি, মাস্টার অফ আর্টস (এমএ), মাস্টার অফ বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এমবিএ), এবং ডক্টরেট অফ ফিলসফি (পিএইচডি) ডিগ্রি সম্পন্ন করেন। এমন মেধাবী ও উচ্চশিক্ষিত মানুষ যখন কোনো দায়িত্ব গ্রহন করে তখন তা সার্বিকভাবে সফল হতে বাধ্য। এছাড়াও জাতিগতভাবে দেখতে গেলে মোহন যাদব একজন ওবিসি সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ। ভারতের পিছিয়ে পড়া মানুষেরা যখন দীর্ঘদিনের অবমাননার পর অবশেষে উপরে উঠে আসতে চলেছে, তখন তাদেরই এক নেতৃত্বকে মুখ্যমন্ত্রী করা নতুন আশার সূচনা করে বৈকি।

একইভাবে ছত্তিশগড়ে মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব সামলাবেন জনজাতি নেতা বিষ্ণু দেও সাই। জনজাতি সম্প্রদায়ের ক্ষমতায়ন সঙ্ঘ পরিবারের দীর্ঘদিনের ঘোষিত অ্যাজেন্ডা। সেই অ্যাজেন্ডারই বাস্তবায়ন হল ছত্তিশগড়ে।

যোগ্য প্রার্থী হিসাবে বিষ্ণু দেও যে দীর্ঘদিন ধরেই উচ্চ নেতৃত্বের নজরে ছিলেন তা বোঝা যায় প্রচার চলাকালীন অমিত শাহের একটি কথায়। ছত্তিশগড়ের কুঙ্কুরি বিধানসভা কেন্দ্রে একটি জনসভায় বলেছিলেন, "আপনারা তাকে এমএলএ বানান, আমরা তাকে একজন বড় মানুষ বানিয়ে দেবা" এই বড় মানুষ অর্থ যে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী - এই কথা বোঝা গেল ভোটের ফলাফলের পরে।

রায়পুরে ৫৪ জন নব-নির্বাচিত বিধায়কের বৈঠকে সাইকে বিজেপির আইনসভা দলের নেতা হিসাবে ঘোষণা করার পরে তিনি বলেছিলেন, “নম্রতাকে দুর্বলতা হিসাবে বিবেচনা করা উচিত নয়। আমি এটাকে আমার শক্তি বলে মনে করি এবং আমি সারা জীবন নম্র থাকার চেষ্টা করব।” সাই ২৫,০০০ ভোটের ব্যবধানে বর্তমান কংগ্রেস বিধায়ক উদিত মিঞ্জকে পরাজিত করে জয়লাভ করেছেন। আর তারপরেই বর্ষীয়ান বিজেপি নেতা, তিনবার মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব সামলানো রমন সিং এর স্থলাভিষিক্ত হন সাই। নতুন নেতৃত্বদের তুলে আনার যে প্রয়াস ছত্তিশগড়ে দেখা গেছে তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়।

এছাড়াও পরিবারসূত্রেও তিনি হিন্দুত্ববাদী আদর্শের সাথে যুক্ত। নিজেও কোনো উড়ে এসে জুড়ে বসা ধরনের নেতা নন। পঞ্চায়েত স্তর থেকেই তাঁর যাত্রা শুরু হয়েছিল। পূর্বতন জনসংঘ (অধুনা বিজেপি)-এর সঙ্গে তাঁদের কয়েক পুরুষের সম্পর্ক ছিল।

অন্যদিকে রাজস্থানে মুখ্যমন্ত্রী হলেন সঙ্ঘের সাথে যুক্ত ব্যক্তি ভজনলাল শর্মা। সবকা সাথ সবকা বিকাশ এর নজির দেখা যায় এখানেও। দলিত বা জনজাতিদের উত্থান মানেই যে অন্যদের অবনমন নয় তা বুঝিয়ে দেওয়া হয় ব্রাহ্মন ভজনলালের পদপ্রাপ্তিকে। প্রায় অর্ধডজন মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থীকে সরিয়ে এখানে এই দায়িত্ব দেওয়া হয় ভজনলাল শর্মাকে।

ভরতপুর জেলার নাদবাই তহসিলের আটারি গ্রামের বাসিন্দা ভজনলাল স্কুলেই এবিভিপি-তে যোগ দিয়েছিলেন। তাকে জেলা সহ-আহ্বায়কও করা হয়েছে। ১৯৯১ সালে তিনি বিজেপির ছাত্র শাখা ভারতীয় জনতা যুব-মোর্চার জেলা ইউনিটের প্রধান হন। মাত্র ২৭ বছর বয়সে সরপঞ্চ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং জয়ী হন। জেলা সভাপতি ও সহ-রাজ্য সভাপতির দায়িত্ব সামলানোর অভিজ্ঞতাও তাঁর আছে।

রাজস্থান ইউনিভার্সিটি থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর ভজনলাল রাষ্ট্রের প্রতিও তার আনুগত্য প্রদর্শন করেছেন। ১৯৯০ সালে এবিভিপি-এর কাশ্মীর বাঁচাও আন্দোলনে অংশ নেওয়ার সময়, তিনি অন্যান্য কর্মীদের সাথে উধমপুরে জেলে যান এবং ১৯৯২ সালে রাম জন্মভূমি আন্দোলনে তিনি আবারও গ্রেপ্তার বরণ করেন।

বেশ কয়েকজন হেভিওয়েট প্রার্থীকে সরিয়ে ভজনলাল শর্মার দায়িত্বপ্রাপ্তি এটাই ইঙ্গিত করে যে বিজেপি ভারতের জন্যে নতুন নেতৃত্ব তুলে আনতে চাইছে। এবং তুলে আনছেও। ক্ষমতা কারও হাতে দীর্ঘদিন কুক্ষিগত থাকলে তা অপব্যবহার হতে বাধ্য। Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely - ব্রিটিশ ঐতিহাসিক অ্যাকটন বলেছিলেন। ক্ষমতা কখনই দীর্ঘস্থায়ী হওয়া উচিত নয়। বিজেপিও নতুন নতুন নেতৃত্ব তুলে এনে সেটাই বুঝিয়ে দিচ্ছে যে ভারত কোনভাবেই আর পিছনের দিকে ফিরবে না। বিজেপি কোনোভাবেই দ্বিতীয় কংগ্রেস হবে না।

কংগ্রেস সহ অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলো যেখানে পরিবারের কায়েমি স্বার্থ বজায় রাখার জন্যে নতুন নেতৃত্ব তুলে আনবেনা বলে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে আছে, তারা যখন জাতভিত্তিক জনশুমারির মাধ্যমে ভারতের মানুষকে একে অন্যের সাথে লড়িয়ে দিতে আগ্রহী - সেই সময়ে নতুন নেতৃত্বকে দায়িত্ব দিয়ে সবাইকে নিয়ে এগিয়ে চলার যে পথ ভারতীয় জনতা পার্টি দেখিয়েছে তা অবশ্যই ভারতের ইতিহাসে এক দিকনির্ণায়ক হিসাবে দেখা উচিত।

২৪-এর মহারণে
বিজেপি অপ্রতিরোধ্য

ড. পঙ্কজ কুমার রায়

ভারতের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী কে সেটা ২০২৩ সালেই ঠিক হয়ে গেছে। কেননা বিরোধী দলের কোন প্রধানমন্ত্রীর মুখ নেই। একসময় প্রধানমন্ত্রী হবে বলে জেদ ধরেছিলেন মমতা। কিন্তু যে হারে তাঁর দলের নেতারা চুরির দায়ে জেলে যাচ্ছে, তাতে বেগতিক বুঝে তিনি হাল ছেড়ে দিয়েছেন। বাকী রইল রাহুল আর নীতিশ। নীতিশ তাঁর কাধে বন্দুক রেখে কংগ্রেসকে গদি ছাড়বেনা। আর রাহুল? আরেকটু বড় হোক। দেখা যাবে। কিন্তু যেই হোকনা কেন সবার লড়াই নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে কিন্তু প্রধানমন্ত্রী হতে গেলে তো বিজেপি দলটাকে হারাতে হবে। আর তার জন্য যে সাংগঠনিক দক্ষতা এবং সংগঠক দরকার তা কি আছে রাহুল, খাড়গে বা কংগ্রেসের? সুতরাং নরেন্দ্র মোদিই তৃতীয়বার- অব কি বার ৪০০ পার।

১৯৮০ সালের ৬ই এপ্রিল ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) প্রতিষ্ঠার পর ১৯৮৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে মাত্র ২টি আসনে জয়যুক্ত হয়। পরবর্তী পর্যায় ২০০৪ সালে ১৩৮টি, ২০০৯ সালে ১১৬টি, ২০১৪ সালে ২৮২টি এবং সর্বশেষ লোকসভা নির্বাচনে ৩০৩ আসনে জয়যুক্ত হয়। ২০১৪ এবং ২০১৯ সালে বিজেপি নির্বাচনে লড়ে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে। অটল বিহারী বাজপেয়ীর উত্তরসূরী হিসেবে মোদীর সফল নেতৃত্ব বিজেপিকে বিপুল জনভিত্তি, বিশ্বের বৃহত্তম দল এবং ভারতকে ৪ ট্রিলিয়ন ডলার অর্থনীতির দেশে পরিণত করেছে। ১৯৯৫ সালে ভারত ১ ট্রিলিয়ন ডলার অর্থনীতিকে স্পর্শ করে ট্রিলিয়নিয়ার হাব অর্থাৎ পৃথিবীর দশম আর্থিকভাবে সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল ১৯৪৯ সালের স্বাধীনতার ৪৮ বছর পর। কিন্তু মাত্র ২৮ বছর পর ২০২৩ সালে ভারতের অর্থনীতির আয়তন ৪ ট্রিলিয়ন ডলারে পৌঁছলো এবং বিশ্বের পঞ্চম আর্থিকভাবে শক্তিশালী দেশ হবার গৌরব অর্জন করতে সমর্থ হয়েছে।

২০২৪ লোকসভা নির্বাচনের পূর্বে ২০২৩-এ চার রাজ্যের ফলের গতিপ্রকৃতি বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। গো-বলয় বা হিন্দি হার্ট ল্যান্ডে বিজেপি'র ২২০ লোকসভা আসন পাওয়া এক প্রকার নিশ্চিত। অবশিষ্ট ভারত থেকে ন্যূনতম ৫০টি লোকসভা আসন পাওয়া কেবল সময়ের অপেক্ষা। শক্তিশালী অর্থনীতির গড়, ৩৭০ ধারার বিলোপ, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুসারে স্বস্থানে রামমন্দির নির্মাণ, তালাক প্রথার বিলুপ্তি, সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পে জনতা জনধনের পাশে দাঁড়ানো এনডিএ সরকারকে বাড়তি শক্তি জুগিয়েছে।

চার রাজ্যের মধ্যে মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, রাজস্থান বিজেপির দখলে। তেলেঙ্গানায় জয়ী কংগ্রেস। সেমিফাইনালের আগে স্কোর কার্ড

চার রাজ্যের আসনে ভোট শতাংশের বিন্যাস

মধ্যপ্রদেশ (মোট আসন ২৩০)

	২০১৮	২০২৩ (আসন)	২০১৮	২০২৩ (ভোট শতাংশ)
বিজেপি	১০৯	১৬৩ (+৫৪)		৪৮.৫৫ (+৭.৫৩)
কংগ্রেস	১১৪	৬৬ (–৪৮)		৪০.৪০ (–০.৪৯)
বিএসপি	২	০ (–২)		৪.০ (–২.৮১)
অন্যান্য	৫	১ (–৪)		৫.৭ (–৫.৬৩)

রাজস্থান (মোট আসন ১৯৯)

	২০১৮	২০২৩ (আসন)	২০১৮	২০২৩ (ভোট শতাংশ)
বিজেপি	৭৩	১১৫ (+৪২)		৪২.৪ (+৩.৫৪)
কংগ্রেস	১০০	৭০ (–৩০)		৩৯.৬ (–০.০৩)
বিএসপি	৬	২ (–৪)		২.০ (–২.০১)
অন্যান্য	২০	১২ (–৮)		১৬ (–১.৫)

ছত্তিশগড় (মোট আসন ৯০)

	২০১৮	২০২৩ (আসন)	২০১৮	২০২৩ (ভোট শতাংশ)
বিজেপি	১৫	৫৪ (+৩৯)		৪৬.৩ (+১৩.২২)
কংগ্রেস	৬৮	৩৫ (–৩৩)		৪২.৭ (–০.৩৬)
বিএসপি	২	১ (–১)		৪ (১.৫৭)
অন্যান্য	৫	০ (–৫)		৭.১ (–১১.২৯)

তেলঙ্গানা (মোট আসন ১১৯)

	২০১৮	২০২৩ (আসন)	২০১৮	২০২৩ (ভোট শতাংশ)
বিজেপি	১	৮ (+৭)		১৫.৫ (+৮.৫১)
কংগ্রেস	১৯	৬৫ (+৪৬)		৪২.২ (+১১.৩৯)
বিআরএস	৮৮	৩৯ (–৪৯)		৩৯ (–৭.৯২)
এআইএম আইএম	০	৭ (০)		৭.১ (–১.৭৬)
অন্যান্য	৪	০ (–৪)		৪.৩ (–১০.২২)

সূত্র: আনন্দবাজার, এই সময় ও অন্যান্য সংবাদপত্র।

তিনটি রাজ্য ছত্তিশগড়, মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থানে বিজেপি'র ভোট বেড়েছে যথাক্রমে ১৩.২২ শতাংশ, ৮.৯১ শতাংশ ও ৩৫৪ শতাংশ এবং আসন বেড়েছে যথাক্রমে ৩৯টি, ৫৪টি ও ৪২টি। তেলঙ্গানার ক্ষেত্রে বিজেপি'র ভোট শতাংশ বেড়েছে ৮.৫১ শতাংশ ও আসন বেড়েছে ৭টি। অন্যদিকে এই চার রাজ্যে মূল প্রতিদ্বন্দ্বী কংগ্রেসের ভোট ছত্তিশগড়, মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থানে কমেছে যথাক্রমে (-) ০.৩৬ শতাংশ, (-) ০.৪৭ শতাংশ ও (-) ০.০৩ শতাংশ। কিন্তু আসন কমেছে ৩৩টি, ৪৮টি ও ৩০টি। এই বিরাট পার্থক্যের কারণ বিজেপি'র তাৎপর্যপূর্ণ ভোটবৃদ্ধি।

কথায় আছে, ছোট যে হয় অনেক সময় বড়র দাবি দাবিয়ে চলে। সেক্ষেত্রে তেলঙ্গানাতে বিজেপি'র ভোট ৮.৫১ শতাংশ বৃদ্ধি হয়েছে এবং আসন বৃদ্ধি পেয়েছে ৭টি। পশ্চিমবঙ্গে যেমন ৩ থেকে ৭৭টা বিজেপি পৌঁছে গিয়েছে তেমনি সম্ভাবনা ভবিষ্যতে প্রবল। কারণ, বিজেপি

১৫.৫ শতাংশ ভোট প্রাপ্তির পর্যায়ে চলে গেছে। ৬.৫ শতাংশ ভোট থেকে এখানে পৌঁছানো ভবিষ্যতের ক্ষমতা দখলের প্রথম সোপান। এখানে যদিও কংগ্রেস পুরনো ভোট পুনঃরুদ্ধার করে ১১.৩৯ শতাংশ ভোট বাড়িয়ে ৪৬টি আসন বাড়াতে সমর্থ হয়েছে। বিন্ধ্যপর্বতের পশ্চিমে বিজেপি কর্ণাটকের পর তেলঙ্গানায় শক্ত ভিতের ওপর দাঁড়াতে সমর্থ হয়েছে।

বর্তমানে বিজেপি ভারতের ৫৮ শতাংশ আয়তন ও ৫৭ শতাংশ জনসংখ্যার বিন্যাসে পৌঁছতে সমর্থ হয়েছে। অন্যদিকে, অ-বিজেপি দলগুলি ৪১ শতাংশ ভূখণ্ড ও ৪৩ শতাংশ জনবিন্যাসে বিস্তৃত। তাই একথা বলাই যায়, ২০২৪-এ হ্যাটট্রিকের গ্যারান্টি মোদির।

তিনিই হবেন জহরলাল নেহেরুর পর প্রথম প্রধানমন্ত্রী যিনি ভারতের তৃতীয় বারের জন্য পূর্ণ সময়ের প্রধানমন্ত্রী। সশক্ত ভারত-আত্মনির্ভর ভারত ২০২৪, মোদির অভিশেকের অপেক্ষায়।

বিকশিত ভারত

মোদির গ্যারান্টি

জয়ন্ত গুহ

স্বাধীনতার শতবর্ষে মানে ২০৪৭-এর আগে দেশের কোথাও যেন একজনও দরিদ্র, কৃষক, নারী ও যুবক বঞ্চিত না থাকে সরকারি প্রকল্প থেকে, এদের ক্ষমতায়ন হলেই দেশ শক্তিশালী হবে, বিকশিত হবে। আর এদের জন্যই ঘরে ঘরে পৌঁছে যাচ্ছে 'মোদি গ্যারান্টি'-র গাড়ি। নিজের দল বা সরকারের স্বার্থে নয়, বিকশিত ভারতের স্বার্থে আপনিও সঙ্কল্প নিন। এটুকুই শুধু চাইছেন দেশের প্রধানমন্ত্রী।

"যারা কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্পগুলির সুবিধা পেয়েছেন তাঁদের থেকে অভিজ্ঞতা শুনে নিন | যারা এখনও প্রকল্পগুলিতে রেজিস্টার করাননি, তাঁরা এবার করিয়ে ফেলুন | আমাদের কাছে দেশের প্রত্যেক নাগরিক ভগবান স্বরূপ," বলছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। আপনার মহল্লা, গ্রামে বা পঞ্চায়েতে যদি আপনার প্রতিবেশী বা চেনাপরিচিতকে সহজ কথায় বুঝিয়ে বলতে হয় প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্ন প্রকল্প 'বিকশিত ভারত সঙ্কল্প যাত্রা' আসলে কি? তাহলে প্রধানমন্ত্রীর নিজের কথায় ওপরের তিনটি লাইনের থেকে এত সহজ সরল ব্যাখ্যা আর কিছুই হতে পারেনা। ২০২৩-এর নভেম্বর মাসে, জম্মুর রংপুর গ্রামের পঞ্চায়েত প্রধান বলবীর কাউরের সঙ্গে জমিয়ে আড্ডা দিচ্ছিলেন প্রধানমন্ত্রী। হাসিঠাট্টার মাঝেই গল্পচ্ছলে যেমন 'বিকশিত ভারত যাত্রা' নিয়ে বলেন তেমনি আবার, স্বাধীনতার এত বছর বাদে তাঁর সরকারকে 'বিকশিত যাত্রার' সঙ্কল্প নিতে হল কেন তা নিয়ে সহজভাবে বুঝিয়ে বলেন, "আগের সরকারের মতো নই আমরা। পূর্বের সরকার নিজেদের অভিভাবক হিসেবে দেখত। এর জেরে একটি বড় অংশের

মানুষ সাধারণ পরিষেবাগুলি থেকে বঞ্চিত হতেন। স্বাধীনতার পর দশকের পর দশক ধরে কোনও সরকারি প্রকল্পের পরিষেবা পাননি একটি বিরাট অংশের মানুষ।" - প্রসঙ্গক্রমে পঞ্চায়েত প্রধান বলবীর কউর প্রধানমন্ত্রীকে বলেন, "তিনি একটি ট্র্যাক্টর কিনেছেন কিষাণ ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করে।' স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিমায় নরেন্দ্র মোদী বলেন, 'আপনার কাছে তো তাও ট্র্যাক্টর রয়েছে। আমার তো একটা সাইকেলও নেই।" সঙ্গেসঙ্গেই সবাই গড়িয়ে পড়ে হাসিতে। হ্যাঁ, এটাই নরেন্দ্র মোদি। দেশজুড়ে চলা বিকশিত ভারত সঙ্কল্প যাত্রার একটি অনুষ্ঠানে গিয়ে তিনি কিন্তু গম্ভীর গলায় জ্ঞানের কথা বলেননি, আত্মপ্রচার করেননি বরং হাসিঠাট্টায় সকলকে কাছে টেনে নিয়ে 'বিকশিত ভারত' - এর সংকল্পে বেঁধে দিলেন সবাইকে। তিনি হাড়েহাড়ে জানেন, সকলের প্রয়াস ছাড়া সকলের বিকাশ হবেনা কিন্তু সেটা করতে হবে বন্ধু হয়ে। হাসিঠাট্টায়, গল্পচ্ছলে। নাহলে মুখ থুবড়ে পড়বে সরকারী এই প্রকল্প, রয়ে যাবে শুধু খাতায় কলমে। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিটি প্রকল্প ঘরে ঘরে মানুষের কাছে পৌঁছে গিয়েছে কি না, তার খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে বিকশিত ভারত সঙ্কল্প যাত্রায়। এবং বারেবারে প্রধানমন্ত্রী বলছেন, যারা লাভার্থী (প্রকল্প থেকে যারা সুবিধা পেয়েছেন) তাঁরা অন্যদেরকে বুঝিয়ে দিন কিভাবে প্রকল্পের জন্য আবেদন করতে হবে, কারা আবেদন করতে পারবেন, কি কি সুবিধা পাবেন এবং যারা এখনও প্রকল্প থেকে সুবিধা পাননি বা আবেদন করেননি তাঁরা লাভার্থীদের কাছে জিজ্ঞাসা করে জেনে নিন।

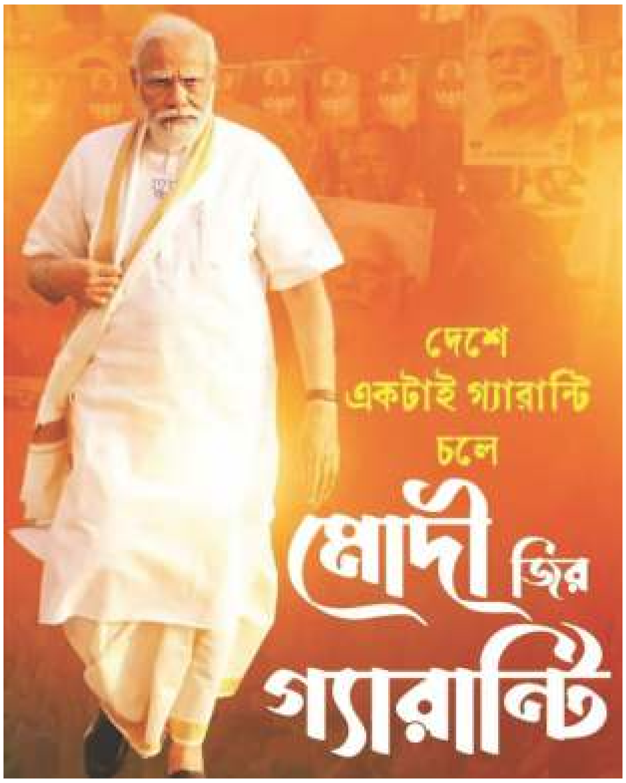

নিজেকে বিকশিত ভারত সংকল্পের সঙ্গে জুড়ে গোটা দেশের প্রতিটি ইঞ্চির প্রতিটি মানুষকে মোদির দেওয়া গ্যারান্টির সঙ্গে জুড়ে দিয়ে, 'বিকশিত ভারত সঙ্কল্প যাত্রা' দেশজুড়ে এক জনআন্দোলনের রূপ নিয়েছে। এই জনআন্দোলনের মূল লক্ষ্য, স্বাধীনতার শতবর্ষে মানে ২০৪৭-এ ভারত হয়ে উঠবে বিশ্বের প্রথম তিনটি উন্নত দেশের মধ্যে একটি এবং তার আগে দেশের কোথাও যেন একজনও দরিদ্র, কৃষক, নারী ও যুবক বঞ্চিত না থাকে সরকারি প্রকল্প থেকে - এদের ক্ষমতায়ন হলেই দেশ শক্তিশালী হবে, বিকশিত হবে। আর এদের জন্যই ঘরে ঘরে পৌঁছে যাচ্ছে 'মোদি গ্যারান্টি'-র গাড়ি। ২০২৪-এর ৫ জানুয়ারি, বিকশিত ভারত সঙ্কল্প যাত্রা মাত্র ৫০ দিনে পা ফেলতেই সুরক্ষা বীমা যোজনা, জীবনজ্যোতি যোজনা, প্রধানমন্ত্রী সম্মাননিধির জন্য লক্ষাধিক আবেদন পত্র এবং উজ্জ্বলা সংযোগের জন্য ১২ লক্ষ নতুন আবেদন গৃহীত হয়েছে। ৭.৫ লক্ষ মানুষ পিএম-স্বনিধি যোজনায় পেয়েছে আর্থিক সহায়তা। ২০২০ সালে শুরু হওয়া হকারদের জন্য এই প্রকল্পে ১০ হাজার, ২০ হাজার এবং ৫০ হাজার টাকার তিনটি কিস্তিতে ঋণের সাহায্য পাবে সুবিধাভোগীরা। ৩৩ লক্ষেরও বেশী মানুষ যাত্রা চলাকালীন নাম নথিভুক্ত করিয়েছে পিএম-কিষাণ যোজনায়। বিপুল উৎসাহে মাত্র ৫০ দিনেই দেশে ১০ কোটি মানুষ অংশ নিয়েছে এই যাত্রায়। হ্যাঁ, ঠিক শুনছেন। ১০ কোটি মানুষ ! যে সংখ্যা কার্যত ছাপিয়ে গেছে অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, জার্মানি, ফ্রান্স, ইতালি এবং সাউথ আফ্রিকার মত বেশ কিছু বড় দেশের মোট জনসংখ্যাকে। যাত্রা চলাকালীন বিকশিত ভারত স্বাস্থ্য ক্যাম্পে এসে (৫ জানুয়ারি পর্যন্ত) চেকআপ করিয়েছে ২.২ কোটি মানুষ । ১.৭ কোটি মানুষ পেয়েছে আয়ুষ্মান কার্ড। গোটা দেশে যে যোজনা গরীব মানুষের কাছে ঈশ্বরের আশীর্বাদের মত। এই যোজনায় দরিদ্রদের জন্য ৫ লক্ষ টাকা স্বাস্থ্য বীমা প্রদান, বিনামূল্যে ডায়ালিসিস, জন-ঔষধি কেন্দ্রগুলিতে কম দামে ওষুধ দেওয়ার ব্যবস্থা আছে । ২০১৪-২০২৩ পর্যন্ত নরেন্দ্র মোদি সরকারের বিভিন্ন দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচী এবং প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (গ্রামীণ), জাতীয় গ্রামীণ জীবিকা মিশন (এনআরএলএম), পিএম-কিষাণ যোজনা, ফসল বীমা যোজনা, পোষণ অভিযান, উজ্জ্বলা যোজনা, আয়ুষ্মান ভারত, জন-ঔষধি প্রকল্প, পিএম গরীব কল্যাণ অন্ন যোজনা, বিশ্বকর্মা যোজনার মত জনকল্যাণমূলক যোজনা সমাজের তৃণমূল স্তর পর্যন্ত বাড়ি বাড়ি গিয়ে পৌঁছে দেওয়াটাই বিকশিত ভারত সঙ্কল্প যাত্রার মূল মন্ত্র। বিনামূল্যে এইসব সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পাবেন সবাই, জাতপাত ও ধর্ম নির্বিশেষে। বিকশিত ভারতের স্বার্থে আপনিও সঙ্কল্প নিন, প্রকল্পের সহায়তা পেতে অন্যদের সাহায্য করুন এবং মোদি সরকারের প্রকল্পকে নিয়ে যান ঘরে ঘরে। এটুকুই শুধু চাইছেন দেশের প্রধানমন্ত্রী।

দেশের 'বিশ্বকর্মা'দের পাশে নরেন্দ্র মোদি

বিনয়ভূষণ দাশ

গত ৯ বছরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির হাত ধরে বিশ্বজুড়ে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে ভারতবর্ষ। এবার সেই ভারতবর্ষের 'বিশ্বকর্মা'দের হাতে তৈরি শিল্প দেশ ও বিদেশের ঘরেঘরে পৌঁছে দিতে এবং শিল্পীদের যোগ্য সম্মান দিতে নরেন্দ্র মোদীর স্বপ্ন প্রকল্প - 'প্রধানমন্ত্রী বিশ্বকর্মা কৌশল সম্মান যোজনা'। প্রধানমন্ত্রীর নিজের কথায়, "স্বাধীনতার পর আমাদের দেশের দক্ষ শিল্পীরা সরকারের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা পাননি। বহু মানুষ তাদের পূর্বপুরুষের ও ঐতিহ্যশালী পেশা ছেড়ে দিচ্ছেন যথাযথ সুযোগের অভাবে। আমরা শিল্পীদের এভাবে ছেড়ে দিতে পারি না। 'পিএম বিশ্বকর্মা কৌশল সম্মান' দেশের শিল্পী ও কারিগরদের জন্যই তৈরি করা হয়েছে। শিল্পীদের সুযোগ বৃদ্ধির পাশাপাশি তাঁদের তৈরি পণ্য যাতে দেশ-বিদেশে পৌঁছে যেতে পারে, সেই প্রচেষ্টাই করছি আমরা।"

শ্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে বিজেপি কেন্দ্রে ২০১৪ সালে ক্ষমতাসীন হয়। এই নয় বৎসরে শ্রী মোদির নেতৃত্বে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার শুধু সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রেই নয়, দেশের আর্থিক উন্নয়নের ক্ষেত্রেও যুগান্তকারী বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। 'সবকা বিকাশের' জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে শ্রী মোদির নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকার।

এই নয় বৎসরে দেশের নাগরিকদের সামগ্রিক আর্থিক উন্নয়নের প্রয়াসে নানান গুরুত্বপূর্ণ নীতি প্রণয়ন ও তা কাজে প্রয়োগ করেছে এই সরকার। সেই কাজের তালিকা দীর্ঘ। দীর্ঘ সেই তালিকায় অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন হল 'প্রধানমন্ত্রী বিশ্বকর্মা কৌশল সম্মান যোজনা ২০২৩'। প্রকল্পটি 'পি এম বিকাশ যোজনা' হিসেবেও পরিচিত। এই প্রকল্পটি প্রধানমন্ত্রী শ্রীনরেন্দ্র মোদি বিশ্বকর্মা

প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্ন প্রকল্প 'বিশ্বকর্মা' যোজনা।

বিভিন্ন ক্ষেত্রের শিল্পীদের সম্মান জানাতে স্বাধীনতার পর এমন প্রকল্প এই প্রথম।

জয়ন্তীর দিন, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৩-এর ঘোষণা করেছেন। এটি মোদিজীর ৭৩তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে দ্বারকার ' যশভূমি কনভেনশন সেন্টারে' ঘোষিত হয়। যদিও অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন ২০২৩- ২০২৪-এর বাজেট বক্তৃতার সময়ই প্রকল্পটি ঘোষণা করেছিলেন। আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হয় সেপ্টেম্বরে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় এটি স্বীকৃত হয় ১৬ আগস্ট ২০২৩এ। প্রকল্পটি সমগ্র দেশের গ্রামীণ ও শহরের ক্ষেত্রে কার্যকর হবে। এই প্রকল্পের জন্য এক বিশাল অঙ্কের অর্থ , ১৩০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। প্রকল্পটি ২০২৩-২৪ আর্থিক বৎসর থেকে ২০২৭-২৮, এই পাঁচ আর্থিক বৎসর ধরে জারী থাকবে। এই প্রকল্পটি বিশেষভাবে অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীভুক্তদের ক্ষমতায়ন সুনিশ্চিত করবে।

প্রকল্পটিতে ১৮ ধরণের কর্মে নিযুক্ত কারিগর/ শিল্পীদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এঁরা হলেন সুতার, নৌকা নির্মাণ শিল্পী, কুমোর, কামার/ লোহার,হাতুড়ি ও টুলকিট নির্মাতা, ভাস্কর শিল্পী, চাবি প্রস্তুতকারক, স্বর্ণশিল্পী, মূর্তিকার/ পাথর খোদাইকারী, চর্মকার, জুতা প্রস্তুতকারী, রাজমিস্ত্রী, ঐতিহ্যবাহী পুতুল প্রস্তুতকারী , নাপিত, মালাকার, ধোপা, দর্জি এবং মাছ ধরার জাল প্রস্তুতকারী, ঝুড়ি, মাদুর ও ঝাড়ু প্রস্তুতকারী, বাদ্যযন্ত্র নির্মাতা ইত্যাদি।

এই প্রকল্প অনুযায়ী বিভিন্ন হস্তশিল্পীদের/ কারিগরদের স্বীকৃতি স্বরূপ 'পিএম বিশ্বকর্মা সার্টিফিকেট', আই ডি কার্ড, এবং স্বল্পসুদে (৫%) দুটি পর্যায়ে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে। এই সহায়তার পরিমাণ ১ থেকে ২ লক্ষ টাকা। তাছাড়া তাঁদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ ৫-৭ দিনের জন্য , প্রশিক্ষণ চলাকালে প্রতিদিন ৫০০ টাকা করে ভাতা, যন্ত্রপাতি কেনার জন্য ১৫০০০ টাকা দেওয়া হবে।

প্রধানমন্ত্রী বিশ্বকর্মা যোজনা

২০২৩

[illegible]

'বিশ্বকর্মা' যোজনা নিয়ে বিজেপি রাজ্য নেতৃত্ব ও কর্মীদের বৈঠক।

প্রকল্পটির সুবিধা পেতে হলে নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করতে হবেঃ-

ধাপ ১ — রেজিস্ট্রেশন

এটি ২০২৩ এর ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হয়েছে। সংশ্লিষ্ট পোর্টাল – https://pmvishwakarma.gov.in/

নিজের আধার কার্ড এবং মোবাইলের মাধ্যমে এই প্রকল্পটিতে অংশগ্রহণ করা যাবে। মোবাইলের মাধ্যমে একটি ওটিপি পাওয়া যাবে।

ধাপ ২ — ফর্ম ফিলআপ

ওটিপি নিশ্চিতকরণের পরে পিএম বিশ্বকর্মা যোজনার রেজিস্ট্রেশন ফর্মটি নাম ও অন্যান্য তথ্য দিয়ে পূরণ করতে হবে। এগুলো করার পরে রেজিস্ট্রেশন ফর্মটি সাবমিট করতে হবে।

ধাপ ৩ — ডাউনলোড

রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হবার পরে পিএম বিশ্বকর্মা ডিজিট্যাল আইডি এবং সার্টিফিকেট ডাউনলোড করা যাবে। এটি ভবিষ্যৎ প্রয়োজনে কাজে লাগবে।

ধাপ ৪ — আবেদন

ডিজিট্যাল আইডি এবং সার্টিফিকেটের তথ্যাদি দিয়ে পিএম বিশ্বকর্মা যোজনার বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য আবেদন করা যাবে।

ধাপ ৫ —ঋণ প্রদান

প্রদত্ত তথ্যাদি সংশ্লিষ্ট আধিকারিকেরা পরীক্ষা করে দেখবেন। এর পরে কোন দলিল-দস্তাবেজ বা সিকিউরিটি ছাড়াই বানিজ্যিক ব্যাঙ্কের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের জন্য ঋণ দেওয়া হবে।

এই প্রকল্পটির জন্য সি এস সি বা Common Services Centre- এর মাধ্যমেও আবেদন করা যাবে। প্রকল্পটিতে উৎপাদিত দ্রব্যসমূহ বাজারজাত করাতেও সরকার সাহায্য করবে। এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত কারিগরদের এমএসএমই স্কিমের মাধ্যমে 'শিল্পোদ্যোগী' হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হবে।

'প্রধানমন্ত্রী বিশ্বকর্মা কৌশল সম্মান যোজনা ২০২৩' প্রকল্পটি গ্রামীণ ও শহুরে ক্ষেত্রে সঠিকভাবে রূপায়িত হলে দেশের, বিশেষ করে গ্রামীণ অর্থনীতি বিরাটভাবে বদলে দিতে সক্ষম হবে। এটি প্রধানমন্ত্রী শ্রীনরেন্দ্র মোদির 'সবকা বিকাশের' গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক।

রাহুলের রাষ্ট্রবিরোধী চিন্তন ব্যাধি

পল্লব মন্ডল

সেই কবে থেকে গান্ধী পরিবার অপেক্ষা করছে রাহুল একদিন বড় হবে, প্রাজ্ঞ হবে। নেই নেই করে বহু টাকা খরচা হল রাহুলকে 'ভারত-জোড়া' নেতা বানাতে। বহু পরিশ্রম, সভা-সমিতি হল কিন্তু রাহুল আর প্রাজ্ঞ হয় নাই। তাঁর 'অল্প বিদ্যা'-র কারণে তিনি অতিকথনে আক্রান্ত। রাজনীতির পাঠে গোল্লা পাওয়া রাহুল এবং তাঁর অন্ধ মোদী বিরোধিতা এখন মিডিয়া ও আমজনতার বিনোদনের বিষয়। দিনরাত মোদিকে গালাগালি করতে করতে কখন যে তিনি এক ভারত বিরোধী রাজনীতিবিদে পরিণত হয়েছেন, তা বোধহয় তিনি নিজেও জানেন না।

রাহুল গান্ধী তাঁর অসমর্থতার কারণে উপহাসের পাত্র হলেও, বর্তমান সরকারের বিরোধিতায় জনসমক্ষে তাঁর আচরণ এবং বক্তব্য ক্রমশ দেশের ক্ষতি করছে। বিজেপি সরকারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য হল মূলধারার গণমাধ্যমের প্রান্তিককরণ। ফলে রাহুল গান্ধীর এই উন্মত্ততা গণমাধ্যমে সহজে পার পেয়ে যাচ্ছে। কংগ্রেস আশ্রিত গণমাধ্যম এবং রাহুল গান্ধী উভয়েই এখন আগের মতো খবরের নিয়ন্ত্রণ নিতে প্রয়াসশীল। এই প্রচেষ্টায় ভারতের নিরাপত্তা, অর্থনীতি এবং বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষতি তাঁর কাছে কোনও বিবেচ্য বিষয় নয়। ২০২৪ সালের নির্বাচনের আগে রাহুল গান্ধী এবং মিডিয়ার এই বিষাক্ত ট্যাঙ্গো ২০৪৭ সালের মধ্যে ভারতের প্রধান বিশ্বশক্তি হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার অবিরাম যাত্রাপথের সবথেকে বড় বাধা হলো কংগ্রেসের মানসিকতা এবং রাহুল গান্ধী। তাই, রাহুল গান্ধীর ক্ষতিকারক, দায়িত্বজ্ঞানহীন এবং নিন্দনীয় বক্তব্যগুলির উপর মনোযোগ দেওয়া প্রাসঙ্গিক।

'রাহুলের রাজ্যজয় কি হবে কোনদিন' ভাবছে সবাই।

চিন প্রসঙ্গে রাহুল গান্ধী:

রাহুল গান্ধীর অপরিচিতমূলক বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে আসুন চিন সম্পর্কে তাঁর মননের বিশ্লেষণ করি। তিনি বলেছিলেন যে, তিনি নাকি ১৫ মিনিটেরও কম সময়ে চিন-কে বিতাড়িত করতেন! অথচ কংগ্রেসের ১৯৬২ সালটি সর্বদা নেহরুর পুশিল্যানিমিটি মনোভাব এবং তাঁর জন্য ভারতকে যে ভয়াবহ মূল্য দিতে হয়েছিল তাঁর জন্য স্মরণ করা হবে। চিনা বাহিনী গোপনে আমাদের ভূখণ্ডে প্রবেশ করেছিল এবং যখন বিরোধী দল এই অনুপ্রবেশের বিষয়টি সংসদে উত্থাপন করে, তখন নেহরু নির্লজ্জভাবে জবাব দেন, "ওখানে একটি তৃণাঙ্কুরও গজায় না"! ভারতের বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার প্রতি কাদা ছোঁড়া সাবেক প্রতিরক্ষা মন্ত্রী এ কে এন্টনি-র মেয়াদকালের পরে ভারত প্রতিরক্ষা প্রস্তুতির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্যভাবে পিছিয়ে পড়েছিল। মোদী সরকারের সঙ্গে ফ্রান্সের চুক্তির মাধ্যমে ৩৬টি রাফাল বিমান কেনায় ভারতের বিমান শক্তি এবং আক্রমণ ক্ষমতাবৃদ্ধি এক অসামান্য কৃতিত্ব। মিডিয়ার সহায়তায়, রাহুল গান্ধী এই চুক্তিকেই দুর্নীতির অভিযোগে দুর্নাম করার অভিযান শুরু করেন যা সুপ্রিম কোর্ট পরীক্ষা করে ক্লিন চিট দেয়। যার জন্য রাহুলকে আদালতে ক্ষমা চাইতে হয়। ভারতের প্রতিরক্ষা ক্ষমতা নষ্ট করার চেষ্টা দেশদ্রোহের মতোই জঘন্য। তার পরও তিনি অপমান অব্যাহত রেখেছেন এবং তাই তাঁর বিরুদ্ধে

একাধিক চলমান মানহানির মামলাও রয়েছে। একটির কারণে তিনি সংসদ থেকে অযোগ্য ঘোষিত হন।

মণিপুর প্রসঙ্গে রাহুল গান্ধী :

তাঁর অতীতের রেকর্ডের সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে, রাহুল গান্ধী প্রায় এক মাস আগে বলেছিলেন যে "ভারতীয় সেনাবাহিনী দুই দিনের মধ্যে মণিপুরের এই বাজে কাজটি বন্ধ করতে পারে কিন্তু প্রধানমন্ত্রী মোদী তা করতে দেয়নি।" আরও একবার, সংবেদনশীল বিষয়গুলিতে ঢিলেঢালা বক্তব্য দেওয়ার রাহুলের ইচ্ছাকৃত প্রচেষ্টা প্রদর্শিত হয়েছিল - এর শিকড় রয়েছে মোদীর প্রতি তাঁর অন্ধ ঘৃণায়। মণিপুর সংঘাতকে প্রাসঙ্গিক করা গুরুত্বপূর্ণ (যা প্রথমে ছিল না)। বর্তমান পরিস্থিতি শুরু হয়েছিল এক মামলাকারীর মামলার সাপেক্ষে আদালতের বিচারকের একক বেঞ্চের দেওয়া একটি রায়ের মাধ্যমে, যা মেইতেই সম্প্রদায়কে বিশেষ মর্যাদা প্রদান করে। এই বিষয়ে রাজ্য সরকারের কোনো ভূমিকা ছিল না এবং এর মাধ্যমে ঐতিহাসিক বিরোধিতা উসকে দেওয়া হয়। প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণে জানা যায় যে, সেনাবাহিনীকে দেখার মুহূর্তেই উভয় সম্প্রদায়ের মহিলারা একটি বেষ্টনী তৈরি করে এবং ভারতীয় সেনাবাহিনীর নিয়ম অনুযায়ী, তারা এগিয়ে যেতে পারেনি। রাজ্যটি দশকের পর দশক ধরে ঐতিহাসিক সংঘাতের কেন্দ্রবিন্দু এবং এর একটি বিশাল আফিম চাষের শিল্প রয়েছে, যার বিরুদ্ধে রাজ্য সরকার অভিযান চালায়, যার ফলে সবকিছুই অগ্ন্যুৎপাতে পরিণত হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে, রাহুল গান্ধীর বলিউডি সিনেমার মতো বক্তব্য তাঁর মানসিক সুস্থতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে।

নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রীর ওপর ব্যক্তিগত আক্রমণ :

এখন পর্যন্ত তাঁর সবচেয়ে নিকৃষ্ট উক্তিতে, রাহুল গান্ধী ঘোষণা করেছেন যে, "এই দেশের যুবকরা ছয় মাসের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী মোদীকে লাঠি দিয়ে মারতে শুরু করবে।" এই বক্তব্যটি তাঁর চরিত্রের মর্যাদার অভাব প্রকাশ করে। এটি রাহুল গান্ধীর চিন্তাধারা এবং ভাষার নিকৃষ্ট মানের প্রতিফলন এবং সাথে সাথে রাহুল গান্ধীর মন্দ লালন-পালনকেও তুলে ধরে। আমরা ২০২৩ সালের শেষের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি এবং সাম্প্রতিক 'ইন্ডিয়া টুডে নির্বাচনী গণনা' অনুযায়ী, প্রধানমন্ত্রী মোদী ২০২৪ সালের নির্বাচনের প্রস্তুতি নিতে সমস্ত বিরোধী দলীয় রাজনীতিবিদদের থেকে এগিয়ে রয়েছেন। রাহুলের জঘন্য জনসমক্ষের আচরণ ক্রমাগতভাবে চাটুকারদের দ্বারা উসকে দেওয়া হয় এবং মূলধারার মিডিয়ার দ্বারা সহানুভূতিশীল হয়, যারা দশকের পর দশক ধরে

স্যাম (পিত্রোদা) কাকুর সঙ্গে রাহুল।

গান্ধী 'পরিবার'।

পদ্মশ্রী পুরস্কার এবং অন্যান্য বিলাসবহুলতার মজা নিয়ে এসেছে কংগ্রেস পার্টির থেকে। রাহুল গান্ধী প্রধানমন্ত্রী মোদীর উচ্চাকাঙ্ক্ষী "মেক ইন ইন্ডিয়া" উদ্যোগকেও উপহাস এবং কটূক্তি করে একটি প্যাভলোভিয়ান প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে বলেন, এটি একটি ফাঁকা স্লোগান, এটি কখনই সফল হবে না"। দেশের উন্নয়নমূলক যেকোনও কিছুর উপহাস করার তাঁর যে বাধ্যতামূলক প্রবণতা তাতে তাঁর বিশ্বস্ততা কোথায় রয়েছে সে সম্পর্কে অনেক কিছু ধারনা করা যায় এবং এটি তাঁর রাজনৈতিক হতাশার প্রতিফলনও বটে। রাহুল গান্ধী সবসময় পরিবারকে প্রথম, চাটুকারদের দ্বিতীয় এবং ভারতকে শেষে রেখেছে। তিনি স্যাম পিত্রোদার কাছ থেকে শেখা তাঁর সীমিত শব্দভাণ্ডার উন্মুক্ত করেছেন যিনি তাকে কেবল দুটি শব্দ শিখিয়েছিলেন: strategic এবং tactical।

IUML ধর্মনিরপেক্ষ:

কংগ্রেস যা দিয়ে বিজেপিকে আটকে দিতে চেষ্টা করেছে সেই সারমর্ম হল ধর্মীয়তাবাদ। অমেঠিতে তাঁর পরাজয়ের পর, রাহুল গান্ধী আইইউএমএলের সাথে হাত মেলান,যারা ভারতকে বিভাজনের দিকে নিয়ে গিয়েছিল। আইইউএমএলের সঙ্গে রাজনৈতিক আঁতাত সুযোগবাদীতার, নির্লজ্জতার, দাসত্বের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এই ক্ষেত্রে, একজন সাংবাদিক তাকে আইইউএমএলের সাথে জোট নিয়ে জিজ্ঞাসা করলে রাহুলের উত্তর ছিল সাধারণ: আইইউএমএল "ধর্মনিরপেক্ষ"। কংগ্রেস পার্টির দেশবিরোধী এবং ইসলামিক আতঙ্কবাদী শক্তির প্রতি দাসত্বের মানসিকতার প্রতিফলন হল সাম্প্রতিক কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি (CWC)-তে পাস হওয়া একটি প্রস্তাব - প্যালেস্টাইন মুক্তি আন্দোলনে পূর্ণ সমর্থন জানানো!!

পরিশেষে এটাই বলা যায়, রাজকীয় রক্তের দাবিদার রাহুল গান্ধী এখন সব লালরেখা পেরিয়ে গেছেন এবং ভারত ও তাঁর ভবিষ্যতের জন্য বিরোধী সবকিছুর পতাকাবাহী হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সবকিছু করেছেন। রাহুল গান্ধী এখন একটি জাতীয় বোঝা হয়ে উঠেছেন এবং ভারতের জন্য সামগ্রিকভাবে একটি স্পষ্ট ও বর্তমান বিপদ তৈরি করেছেন। হতাশায় উদ্বুদ্ধ এই অপুষ্ট লোক, মিডিয়ার দ্বারা সহানুভূতিশীল এবং ভারতবিরোধী শক্তি দ্বারা প্রবলভাবে এই বিষাক্ত মিশ্রণটি ইতিমধ্যেই ভারতবর্ষের বিপুল ক্ষতি করেছে।

ফেক নিউজ

South Asia Index @SouthAsiaIndex Follow

Just IN:— Reports of a drone attack on an Indian vessel in the Indian Ocean, causing an explosion in vessel.

— Incident reported at South West of Veraval, India. UKMTO issues alerts for other ships to transit with caution.

2:52 pm · 23 Dec 23 · 12.1K Views

48 Reposts 1 Quote 287 Likes

7 Bookmarks

১। ফেক নিউজ: পাকিস্তানপন্থী মিডিয়া হাউস এবং তাঁদের নিউজ হ্যান্ডেলের দাবি ছিল ভারতীয় জাহাজে ড্রোন হামলা হয়েছে আর সেটা আবার ভারত মহাসাগরে।

আসল খবরঃ

প্রকৃত তথ্য হল ড্রোন হামলার শিকার হওয়া জাহাজটি ইজরাইলের, ভারতের নয়।

Mohammed Zubair @zoo_bear

Tweet like BJP: 60+ crore Indian Women insulted by BJP by appointing Former WFI chief Brij Bhushan Sharan Singh's close Aid as the new president of Wrestling Federation of India.

ANI @ANI · 1h

#WATCH | Delhi: Wrestler Sakshi Malik breaks down as she leaves after addressing a press conference.

Former WFI chief Brij Bhushan Sharan Singh's aide Sanjay Singh has been elected as the new president of the Wrestling Federation of India.

ফেক নিউজ ফ্যাক্টরির অন্যতম বড় দালাল মহম্মদ জুবের দাবি করে কুস্তি সংস্থার নির্বাচনে ব্রিজভুষণ ঘনিষ্ট সঞ্জয় সিং-কে জিতিয়েছে বিজেপি।

আসল খবরঃ

বাস্তব তথ্য হল সঞ্জয় সিং যাঁকে হারিয়েছেন সেই অনিতা শেওরান ছিলেন সরকার সমর্থিত মহিলা প্রার্থী। শেষ খবর অনুযায়ী সঞ্জয় সিংকে বরখাস্ত করেছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের ক্রীড়ামন্ত্রক। অর্থাৎ সঞ্জয়কে দাঁড় করানোর তথ্য সর্বৈব মিথ্যা এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।

জামালউদ্দিন নামক উত্তর চব্বিশ পরগনার দত্তপুকুরের একজন ভাস্কর্য শিল্পী ও তার ছেলে রাম মন্দিরে ডেকরেশন-এর জন্য প্রভু শ্রী রামচন্দ্রের মূর্তির পাশাপাশি আরো অন্যান্য দেবদেবীর কিছু মূর্তি বানাচ্ছেন। আরো অনেক মূর্তির পাশাপাশি জামালউদ্দিনের তৈরি মূর্তিও শোভা পাবে গর্ভগৃহের বাইরে মন্দিরের সাজসজ্জায়। রাজ্যের জন্য অবশ্যই গর্বের কথা। যদিও কিছু মিডিয়া হাউস দাবি করেছে রামচন্দ্রের মূল মূর্তির নির্মাতা জামালউদ্দিন সাহেব, যা সত্য নয়।

আসল খবরঃ

শ্রী রাম জন্মভূমি ট্রাস্টের জেনারেল সেক্রেটারি চম্পত রায় জানিয়েছেন রামমন্দিরে রামচন্দ্রের প্রধান তিনটি মূর্তি নির্মাণ করেছেন – কর্ণাটকের গণেশ ভাট, অরুণ যোগীরাজ এবং জয়পুরের সত্যনারায়ণ পান্ডে।

৪। ফেক নিউজঃ অ্যান্টি বিজেপি আকাশ ব্যানার্জি এবার ময়দানে নেমেছেন নতুন মিথ্যে নিয়ে। জানাচ্ছেন সাড়ে সাত লক্ষ আয়ুষ্মান ভারত কার্ডের সঙ্গে একটাই নাম্বার জড়িত - ৯৯৯৯৯৯৯৯৯৯। তাঁর দাবি এটা একটা বড় স্ক্যাম।

আসল খবরঃ

বাস্তব সত্য হল সাড়ে ২২ কোটি মানুষ আয়ুষ্মান ভারত ব্যবহার করেন। তার মধ্যে অনেকের মোবাইল নেই। যাদের নেই তাদের ক্ষেত্রে এই নাম্বার দিয়ে ঘর ভর্তি করার কথা বলা হয়েছিল। আর এটা কোনো ব্যবহৃত নাম্বারও নয় তাই দুর্নীতির অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা।

'এ তো গীতার অপমান', ফাঁকা মাঠ, বলছে 'লক্ষাধিক জমায়েত'

নিজস্ব প্রতিনিধি: দাবি করা হচ্ছিল লক্ষ কণ্ঠে হবে গীতাপাঠ। কিন্তু লক্ষ কণ্ঠের জমায়েত যে হয়নি সেটা ফাঁস হয়ে গেল একাধিক সংবাদমাধ্যমের ড্রোন শটের(Drone Shot) মাধ্যমে। সেই সব ড্রোন শটের ছবিই এখন ভাইরাল হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়ায়(Social Media)। একই সঙ্গে সামনে চলে এসেছে বঙ্গ বিজেপির(Bengal BJP) সংগঠনের বেহাল দশার ছবি।

৫। ফেক নিউজঃ লক্ষ কণ্ঠে গীতা পাঠের আয়োজন করা হয়েছিল কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে। বিভিন্ন বামপন্থী এবং তাদের গডফাদার তৃণমূলের নেতারা দাবি করতে থাকেন লোক হয়নি যথেষ্ট। ৩৭০০ লোক হয়েছিল বলে দাবী করেন জেল খাটা কুণাল ঘোষ। পাশাপাশি ৫০০০ লোক হয়েছিল বলে দাবী সিপিএম হার্মাদ নেতারা। কেনা মিডিয়ার একটা বড় অংশও তাদের সঙ্গ দেয় মিথ্যে খবর ছড়ানোর ক্ষেত্রে।

আসল খবরঃ

ব্রিগেডে রেকর্ড তৈরি করে প্রায় দেড় লক্ষ মানুষ একসঙ্গে গীতা পাঠ করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দ্বারকা মঠের শঙ্করাচার্য সদানন্দ সরস্বতী এবং পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের দ্বৈতাপতি।

স্বামী বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তীতে
মহারাষ্ট্রের নাসিকে প্রধানমন্ত্রীর শ্রদ্ধার্ঘ্য।

১২ জানুয়ারি নাসিকের রামকুন্ডে প্রধানমন্ত্রীর
পূজা-পাঠ। রামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠার আগে ১১ দিন
ধরে জপ, ধ্যান, পূজাপাঠে রত থাকবেন প্রধানমন্ত্রী।

নাসিকের পঞ্চবটীতে শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি উৎসর্গীকৃত
কলরাম মন্দিরে ভজন-কীর্তনে রত প্রধানমন্ত্রী।

বাঁধভাঙ্গা উচ্ছ্বাসে মহারাষ্ট্রের নাসিকে
প্রধানমন্ত্রীকে উষ্ণ অভ্যর্থনা।

বিকশিত ভারতের দীর্ঘতম সমুদ্র সেতু, মুম্বইয়ে অটল সেতু উদ্বোধনের পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

ভারতীয় জনতা পার্টি পশ্চিমবঙ্গ শাখার পক্ষে জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক টী.সি. দত্ত মার্চেন্টস প্রা.লি., কলকাতা - ৭০০ ০২৫ হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।